রূপকার নন্দলাল

শান্তিদেব ঘোষ



রূপকার নন্দলাল

শান্তিদেব ঘোষ

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১২

প্রথম প্রকাশ
৬ই ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭ জে পণ্ডিতিয়া রোড, কলি-২৯

প্রচ্ছদ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
চারু খাঁ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ডি. সি. বোস এণ্ড কোং
৬৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩

মুদ্রাকর
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনিয়ন আর্ট প্রেস
২৫-বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

পরিবেশক
গ্রন্থ জগৎ
৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

—আড়াই টাকা—

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য
দেবকুমার বসু



নৃত্য

চিত্রকর : শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

শিল্পাচার্য নন্দলাল

দর্শক হিসেবে বাইরে থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতনকে দেখতে আসেন, তাঁরা এখানকার সাজগোজের সহজ অনাড়ম্বর ভাবটি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন। শান্তিনিকেতনের উৎসবে, অভিনয়ে, নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও আমরা সেই পরিচয়টি দেখতে পাই। এইরূপ অনাড়ম্বর সজ্জার মধ্যে আছে একটি সুন্দর অথচ সংযত রুচির প্রকাশ। এর মধ্যে অনাবশ্যক জাঁকজমকের কোন চেষ্টা নেই। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় এই যে সহজ সৌন্দর্যের বিকাশ তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও তার পরেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিজের সৃষ্টির সামর্থের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপদান করার পথে নন্দলালকে না পেলে কতখানি কৃতকার্য হোতো এবং রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজন ঋষির দ্বারা চালিত না হলে নন্দলালের এই প্রতিভার বিকাশ কোন পথে যেতো তা কে জানে। নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কি প্রকার আগ্রহ জেগেছিল, যদি তার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ পায় তবে তার পরিচয় পাবো এবং রবীন্দ্রনাথ কি চোখে নন্দলালকে দেখতেন তাও জানতে পারব। নন্দলাল বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রেখেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হয়েছিল।

দেশের শিল্পরসিক মহল জানে নন্দলাল বড় চিত্রকর, কাগজের উপর তুলি ও রংয়ের সাহায্যে ছবি আঁকাই তাঁর সাধনা। এচিং, দেয়ালচিত্র ও নানা টেকনিকের সাহায্যে ছবি আঁকায় তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। এপথে তাঁর প্রতিভার বড় দিক হচ্ছে যে, তিনি আলংকারিক। এদিক থেকে তিনি যে বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী একথা সকলেই জানে। কিন্তু তাঁর আলংকারিক প্রতিভার যে অসাধারণ বিকাশ দেখা যায় আর একদিকে, তার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে খুব অল্প কয়েকজনেরই। তাঁর সেই প্রতিভা হোলো নাট্যাভিনয় ও উৎসব ইত্যাদির যাবতীয় রূপসজ্জা।

শান্তিনিকেতনে যে সৌন্দর্যের সাধনা চলেছে তার মূল কারণ হোলো শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নির্জন নিশীথ রাত্রি বা পূর্ণিমার রাত্রি সবই সকলের মনের উপরে বিশেষ ছাপ রেখে যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ এখানে আনন্দের যে আয়োজন করলেন, এই প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে নয়, সম্পূর্ণ এর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। সুতরাং এই আনন্দের আয়োজনের সঙ্গে যে রূপসজ্জার আয়োজন হয়েছে তাতেও যদি মিল না থাকে তবে সে সৌন্দর্যের সৃষ্টি সার্থক হবে না। সচরাচর শান্তিনিকেতনের বাইরের সাজ-সজ্জায় আমরা যে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন দেখি সে সৌন্দর্যের সৃষ্টির মধ্যে শহরের বাইরে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তার স্থান নেই। সুতরাং শহরে যে সমস্ত রূপসজ্জার আয়োজন হয় তা একদিক থেকে শুধু শহুরে জীবনেরই উপযোগী। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক অনুষ্ঠানে তার স্থান অত্যন্ত অনাবশ্যক। সেই জন্য শান্তিনিকেতনের বর্ষা মঙ্গল বা বসন্তোৎসব যে ভাবে জমে ওঠে ও প্রাণ স্পর্শ করে শহুরে উৎসবে আমরা তা পাই না, সেখানে দেখি সে উৎসবের কঙ্কালটিকে। শান্তিনিকেতনের রূপসজ্জার আদর্শের এই হোলো মূল কথা।

শিল্প সমালোচকেরা বলেন ভারতবর্ষের আলংকারিক শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় চিত্রে এর স্থান অতি গভীর ও সহজ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের লোকেরা কাপড়ের উপর যখন জন্তু বা জানোয়ার এঁকেছে তখন সে জানোয়ার কাপড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাবো কাপড়ের বুনুনির ভিতর দিয়ে জন্তুটিকে ভিন্ন আকারে। সেই জন্তুকেই আবার চাটাইয়ের উপর দেখব, চাটাইয়ের বুনুনির সঙ্গে আরেক রূপে। ভারতের যেখানে যে ধরনের পাথর মেলে শিল্পীরা তা দিয়েই মূর্তি গড়েছে তার পাথরত্বকে বজায় রেখে। অর্থাৎ উপকরণকে অতিক্রম করে বা ঢাকা দিয়ে কোন অলংকারই বড় হতে পারে নি। স্থান কাল পাত্র ভেদে এই আলংকারিক শিল্প কিভাবে রূপ গ্রহণ করে তার একটি সুন্দর উদাহরণ দেখাই। বাঙলা দেশের হিন্দুদের যে কোনো মঙ্গল কাজে আমরা দেখি, গৃহের প্রবেশপথের দুপাশে, কলাগাছের নীচে দুটি কলসী বা ঘটের মুখে

আম্রপল্লব ও ডাব রাখা হয় এবং চালবাটার সাহায্যে আল্পনা দেওয়া থাকে। কলাগাছ বা মঙ্গলঘটের সঙ্গে অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকাণ্ডের যে যোগই থাকুক না কেন এটি যে আমাদের বাঙালী জাতির আলংকারিক মনোবৃত্তির একটি বিশেষ উদাহরণ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কলাগাছ, মাটির কলসী, আমপাতা ও ডাব বাঙলার অতি সহজলব্ধ জিনিস। সুতরাং প্রাচীন শিল্পীরা তাঁদের মঙ্গলঘট সাজাতে এই কটি জিনিসকে কাজে লাগাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। প্রচুর ধান যে দেশের প্রধান শস্য সেখানে চালবাটার সাহায্যে আল্পনা দেওয়াও সহজ ছিল। আমাদের পূজা পার্বণের মধ্য দিয়ে এই প্রকার বহু আলংকারিক শিল্পের নিদর্শন আমরা যেমন পাই, তেমনি অন্য প্রদেশে যা অতি সহজে মেলে তাকেই তারা তাদের উৎসবের আলংকারিক শিল্পে স্থান দিয়েছেন। ব্যবহারিক শিল্পে নন্দলাল যে এই একই পথে চলেছেন শান্তিনিকেতনের অভিনয় উৎসবের রূপসজ্জায় আমরা তাই দেখলাম। এটিকেও নন্দলাল একটি বড় রকমের শিল্পসাধনা বলে মনে করেন।

গত ৩০ বৎসর ধরে নন্দলালকে আমরা দেখছি আমাদের সব কিছু আনন্দের আয়োজনের পিছনে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নাট্য, নৃত্যনাট্য ও গীতাভিনয়ের সৃষ্টিতে তন্ময়, সেই সঙ্গে দেখেছি নন্দলালকে মহড়ার সময় অতি সন্তর্পণে নিজেকে আড়ালে রেখে, নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণে মগ্ন। মনের ভিতর কল্পনার তুলিতে সেই সময় সাজসজ্জার একটি একটি করে ছবি এঁকেছেন। দেখেছি অভিনয় বা উৎসবে সেই কল্পনাকে বাইরে যখন প্রকাশ করতেন তখন কি রকম মত্ত থাকতেন প্রকাশের প্রেরণায়। এখনো আশ্রমের উৎসব প্রাঙ্গণের ও অভিনেতাদের সাজসজ্জা তিনি নিজের হাতে সম্পন্ন করেন। শান্তিনিকেতনে নানা প্রকার অভিনয় নৃত্য ইত্যাদি উপলক্ষে বরাবরই তাঁর হাতে সাজবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখন দেখেছি ছবি আঁকতে তিনি যে রকম আনন্দ পান ঠিক সেই আনন্দেই তিনি আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একের পর এক করে সবাইকে সাজিয়েছেন, কত রঙীন বস্ত্রে, কত রকম ফুলে আর কতরকম নিজ হাতে গড়া গয়নায়। আজকে যাকে একভাবে

সাজালেন কালকে আবার তাকে বদলালেন। এইভাবে তাঁর সৃষ্টির কাজ চলতো। তিনি সাজের মধ্যে অনাবশ্যক জাঁকজমকের দ্বারা চোখ ঝল্‌সাবার চেষ্টা করেন নি। যে সাজ আসল মানুষকে ঢেকে ফেলে সে সাজের তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তাঁর সাজে আছে রঙের ছন্দবোধ, পরিচ্ছদের ভাব ও দেহের ছন্দে সাম্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা আছে, রাণী আছে, মন্ত্রী আছে, চর দূত ইত্যাদি আরো কত চরিত্র আমরা দেখতে পাই। কিন্তু নন্দলাল যখন তাদের সাজিয়েছেন, তখন সে সাজ যে কোন্ দেশী রাজার বা মন্ত্রীর বা চরের তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? তা দেখে কখনো বলা চলেনা যে, তা কোনো বিশেষ প্রদেশ বা দেশের অনুকরণ। জামা কাপড়ের রংয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য নানা প্রকারের যে সব টুক্‌রো গায়ে মাথায় নানাখানে লাগান, তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই মনে হবে অকারণ।

গুরুদেবের নাটকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হবে যে, সেই নাটকের মানব চরিত্রও তার সামাজিক জীবন যেন বহুবিস্তীর্ণ কালে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। নন্দলালের এই সব নাটকের রূপসজ্জাও সেই রকমের আদর্শকেই গ্রহণ করেছে বলে মনে করি। তাঁরও সাজসজ্জা গড়ে উঠলো বহু বিস্তীর্ণ একটা যুগকে অবলম্বন করে। তিনি সাজে কখনো কোনো দেশ বা যুগকে নকল করেন নি—কিন্তু তাদের সঙ্গে এ-যুগের মানুষের একটা যোগ রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টাই হোলো তাঁর সাজের মূল কথা। এবং তিনি তাতে কৃতকার্য হয়েছেন।

অনেকের ধারণা নন্দলাল অভিনয় ইত্যাদির সাজসজ্জায় অজন্তা বা প্রাচীন মূর্তিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শ হিসেবে কিন্তু অনুকরণ করেন নি। বরঞ্চ বর্তমানের তথাকথিত আধুনিকেরা কালিদাসের যুগের বর্ণনা অনুযায়ী নৃত্যে মেয়েদের প্রায় আবরণহীন উন্মুক্ত দেহেই মঞ্চে নামিয়েছেন দেখেছি আর দেখেছি নর্তকের শিবতাণ্ডব নৃত্য—শিবের প্রস্তর বা ব্রঞ্জ মূর্তির অনুকরণে সাজ ও ভঙ্গি করতে। এই ধরনের উৎকট অনুকরণ স্পৃহা নন্দলালের মধ্যে কখনো দেখা যায় না। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান সমাজ

ব্যবস্থা ও মানুষের মনের যে পরিবর্তন ঘটেছে এ বিষয়ে নন্দলাল সব সময়ে সতর্ক।

অভিনয়ের রূপসজ্জার পথে তিনি অত্যন্ত আধুনিক। এ যুগের মানুষ হয়েও শিল্পে নিরস বাস্তবতার আদর্শ থেকে তিনি মুক্ত। বর্তমানে অনেকেই মনে করেন আধুনিক হতে গেলেই য়ুরোপের বর্তমান আধুনিকতার আদর্শের অনুকরণ না করলে তা সম্ভব নয়। নন্দলাল এই রকম অনুকরণ মনবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মত বর্তমান। তিনি নাটকের রূপসজ্জার ভিতরু দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, এপথে ভারতীয় রুচি ও আদর্শকে ঠিক রেখেই আধুনিক হতে হবে ভারতবাসীকে। নকল আধুনিকতার নামে নিজের স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিত্ব হারানোকে তিনি মৃত্যুর সমান বলে মনে করেন।

গুরুদেবের নৃত্যনাটিকা 'শাপমোচন'-এ ইন্দ্রসভা আছে। কিন্তু সেখানকার দেবদেবীরা কি সাজসজ্জায় প্রাচীন মূর্তি অজন্তা বা এ যুগের থিয়েটার বা সিনেমার অনুকরণ? "চিত্রাঙ্গদা," "চণ্ডালিকা," ও "তাসের দেশ"-এর সাজে তিনি কোন যুগ বা দেশকে হুবহু অনুকরণ করেছেন এ কথা কেউ বলতে পারবে না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আলোয় মিশে সেই সাজে যখন অভিনেতারা দাঁড়ায় তখন তারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতীয় ছবির মত। সব মিলিয়ে একটি বিশেষ মোহ সৃষ্টি করে।

মাথায় পাগড়ী বাঁধা ভারতবর্ষের একটা চিরন্তন রীতি। কিন্তু নন্দলাল যে পাগড়ী বাঁধেন অভিনয়ের সাজে তা সম্পূর্ণ নতুন। তাই দেখি পাগড়ী বাঁধতে গিয়েও তিনি তাঁর রচনাশক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন। অল্প খরচে সামান্য পিস্‌বোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও নানা রঙের কাগজের সাহায্যে 'তাসের দেশে'র তাসেদের যে অপূর্ব সাজ তিনি রচনা করেছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। তাসের দেশেই প্রথম বুঝেছিলাম যে বড় কবি ও বড় শিল্পীর রচনা যখন এক সঙ্গে মিশে যায় তখন সে রচনা কত সুন্দর হতে পারে। দরকারী বস্ত্র বা গয়নার অভাবে তিনি নিজে কলাগাছের কাণ্ড কাটিয়ে তা থেকে সাদা অংশটি কেটে গয়না করেছেন। শিরীষ গাছের শুকনো পাতলা ফুলগুলি-কেও তিনি ব্যবহার করেছেন গয়নার মত। এ রকম দুঃসাহসিক

পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। তাঁর কাছে ফুল বা ফুলের মালাই হোলো শ্রেষ্ঠ গয়না। তালপাতা, খেজুরপাতা তাঁর হাতে পড়ে পাংক্তেয় হয়েছে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সাজে। অভিনয়ে বা নৃত্যে অনাবশ্যক দামী গয়না বা জরি ও পুঁতির জমকালো সাজের তিনি ঘোর বিরোধী। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের অভিনয়ের সাজে খাঁটি দেশী নানাপ্রকার সুন্দর ভাল শাড়ির ব্যবহার তিনি ভালবাসেন। তবুও এখানে মেয়েরা কখনো কখনো দামী পশ্চিমা ঘাঘরা বা জর্জেট কাপড় দিয়ে তৈরী রং বেরং-এর ঘাঘরা ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রম ঘটেছে সেই শিল্পগুরুর অজান্তে সেই মেয়েদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বা আগ্রহেই। অভিনয় বা নৃত্যে অভিনেতাদের মধ্যে যার রং কালো, তাকে তিনি রং মাখিয়ে ফরসা করার দুর্বলতাকে মনে স্থান দেননি। তিনি কালোকেই এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে সেই কালো রঙের সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি মনে করেন, কোন কিছুকে যদি তার বৈশিষ্ট্য বজার রেখে, তার ভিতরের সৌন্দর্য ফোটানো না যায়, তবে সে রচনার বা সাজের কোন সার্থকতা নেই। যে তা পারে সেই হলো প্রকৃত শিল্পী। নন্দলালের মধ্যে আছে এই ধরনের শিল্প প্রতিভা। তাঁর প্রতিভার বড় পরিচয় হোলো, তাঁকে যে অবস্থায় যেখানেই লোকে কিছু শিল্পকলার নিদর্শন ফোটাতে বলুক না কেন তিনি তাতে কখনো অকৃতকার্য হন না। কারণ তাঁর কাছে মূল্যবান উপকরণের কোন মূল্য বা মোহ নেই। অতি সামান্য নগণ্য তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় বলে যা আমাদের কাছে হেয় তাঁর হাতে পড়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে তারা উচ্চ স্থান পায় ও মূল্যবান হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় গড়া কলাভবনে বাগান যেভাবে রূপ নিয়েছে দেখে মনে হবে না যে এটি মানুষের চেষ্টায় গড়া। সে বাগান নানারকমের যোগ্য অযোগ্য ফুল ফলের গাছে ভর্তি। কোনটি অবহেলার বস্তু হয়ে ওঠেনি। তিনি বহু অর্থব্যয়ে, এদেশের মাটির অযোগ্য ক্ষীণ-প্রাণ গাছ এনে তাঁর কলাভবনের বাগানে লাগিয়ে তিনি তাকে একটি ছোটখাট মোগল আমলের বাগানে পরিণত করার চেষ্টা করেন নি। এ বাগান দেখে মনে হবে এ বীরভূম মাটিরই যোগ্য। এই বাগানের ভিতরকার চলার পথগুলো

অদ্ভূত। মাপ্‌জোক্‌ করা কোন বড় রাস্তা এতে নেই। এতে আছে পায়ে হাঁটা সরু রাস্তা। সেগুলো যেভাবে এঁকেবেকে গেছে পথচারীরা সেভাবেই সময় সংক্ষেপের জন্য তার উপর দিয়ে চলবে। অর্থাৎ বহু বিচিত্র গয়নায় সজ্জিত অহংকারী নারীর মত, গয়নার গর্ব তার কোনরকম সাজসজ্জায়েই প্রকাশ পায় না।

যখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিরাট প্রাঙ্গণ সাজাবার জন্য দেশবাসীর তরফ থেকে মহাত্মা গান্ধী নন্দলালকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র গ্রামবাসীরা যে আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ তাদের চারিদিকে যেসব জিনিস সহজে মেলে তা দিয়েই মহাসভার অঙ্গণকে অতি সুন্দর করে সাজান চলে। সেখানে সাজালেন গরুর গাড়ির রথ, গ্রামের চাষীদেরই নানারঙের বস্ত্রে ও অলংকারে। বাঁশ, চাটাই, শর, খড় দিয়ে সাজালেন সেখানকার সব তোরণ ও ঘর বাড়ি। এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি থাকলে আমাদের দেশের সৌন্দর্য সৃষ্টির যে সহজ উপাদান চারিদিকে রয়েছে তাকে অবহেলা করে বাইরের ধনের আড়ম্বরের প্রতি তাকাবার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁর মত একজন শিল্পী কেন জাতীয় মহাসভাকে সাজাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, এ বিষয়ে একদল লোকের আপত্তি ছিল। তাঁরা বলেছিলেন যে এ কাজে তাঁর মত শিল্পীর মর্যাদা থাকে না। কিন্তু এই কাজের ভিতর দিয়ে শিল্পসাধনার যে আদর্শটিকে তিনি দেশের সামনে ধরেছিলেন তাঁরা তাঁর কাজের সেদিকটাকে একেবারেই ধরতে পারেন নি। আজো পেরেছেন কিনা জানি না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সে কথা বুঝেছিলেন বলেই তাঁকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নন্দলালই এই কাজের একমাত্র উপযোগী ব্যক্তি।

দেশে কোন কোন স্বদেশ প্রেমিকদের মুখে অভিযোগ শুনেছিলাম যে নন্দলালের মত শিল্পীরা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একতালে যদি না চলতে পারেন, তবে তাঁদের শিল্পসাধনার সার্থকতা কি? শিল্পীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁর মনকে আঘাত করে ও শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বড় শিল্পসৃষ্টি সেই

সাময়িক আবহাওয়ায় জন্মলাভ করেও চিরকালের জগতে স্থান গ্রহণ করে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগানো কি দেশসেবার দিক থেকে একটা বড় কাজ নয়? তা ছাড়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে ব্যয়বহুল নয় দেশবাসীকে সে শিক্ষাও তিনি কংগ্রেসের কাজে ও শান্তিনিকেতনের উৎসবের সাজসজ্জার দ্বারা বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন।

আমি মনে করি আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষিত ধনী অধিবাসীদের চেয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ চর্চার মান উন্নত ও মার্জিত। পল্লীগ্রামে দারিদ্র্য যত প্রবলই হোক না কেন তার মধ্যেই গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ি ঘরের প্রত্যেকটি কাজেই যেভাবেই হোক, একটু না একটু আলংকারিক মনোবৃত্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলবেই। নিজেদের ব্যবহারের কাপড় জামা, বসবার চৌকি, চাটাই, বাসনপত্রে, দরজায়, ঘরের চালে ইত্যাদি নানাদিকে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এই কারণে আজকাল শহরবাসী একদল শিক্ষিতরা গ্রামবাসীদের অনুকরণে গয়না, জামা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজেদের উন্নত রুচিবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে। এই গ্রামবাসীদের মত এতটুকু শিল্পবোধও আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যায় না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কোন বস্তুতেই তারা নিজেদের শিল্পবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। সব সময় বাইরের মার্জিত শিক্ষিত শিল্পী এসে তাদের প্রয়োজন না মেটালে তাদের বাড়ি, তাদের সাজসজ্জাতে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রুচির পরিচয়ই প্রকাশ পায়। অর্থশালী শিক্ষিতরা অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতেই শিল্পরুচিকে বিচার করেন বলে তাঁদের সাজসজ্জায় মাত্রাবোধের অভাব অতি দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দেয়।

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল কেবল নিজের মনে রং ও তুলির সাহায্যে ছবি আঁকেন নি, এখানকার উৎসববেদী, প্রাঙ্গণ, উৎসবগৃহ সাজিয়েছেন, এখানকার আশেপাশের নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। খোয়াই-এর কাঁকরের লাল রং, ধানক্ষেতের সাদামাটির রং, উৎসব প্রাঙ্গণে ব্যবহার করেছেন। আলপনা রচনা করলেন চাল, ডাল, তিল, শর্ষে দিয়ে বা রঙীন পাথুরে মাটি ঘসে। কখনো দেখেছি ফুলপাতা

বা ফুলের পাপড়িও ব্যবহার করেছেন আলপনার জন্য। এখানকার যে ঋতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তাকেই উৎসবের কাজে লাগিয়েছেন। শ্রীনিকেতনে দেখেছি আচার্যের বেদীর নীচে নানা প্রকার তরকারি ফলমূল সাজিয়েছেন। কেন না সেগুলিই সেখানকার সাজের উপযুক্ত উপাদান বলে তিনি ভাবেন।

যে ঋতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তা দিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রথম জীবনের সাজসজ্জাও রচিত হয়েছে। কিন্তু তাতে দেখেছি ফুল ব্যবহারকালে পরিমাণ বোধের অভাব। তখন অপর্যাপ্ত ফুল দেখে আনন্দ পেতাম, কিন্তু এখন সেই সব ফুলের অপব্যবহারের কথা মনে পড়লে আজ লজ্জা হয়। বাঙলা দেশের বহু শহরে দেখেছি নাচের বেলায় মেয়েরা মাথায়, গলায়, হাতে কোমরে অনাবশ্যক ফুলের মালা জড়িয়েছে, দেহকে ভারাক্রান্ত করেছে দেখতে সুন্দর লাগবে বলে। অপর্যাপ্ত ফুল বা ফুলের মালা গলায় বা হাতে দিলেও সব সময় তাতে রুচিবোধের খুব ভাল পরিচয় ফুটে ওঠে না। তার জন্য চাই সৌন্দর্যবোধ। যতটুকু দরকার তার বেশী ব্যবহার না করে সেইটুকুকেই কিভাবে সাজালে উভয়ের মধ্যে একটা মিলনের সুন্দর রূপ ফুটে উঠতে পারে শিল্পীর দৃষ্টি ছাড়া এ ঠিক করা কঠিন কাজ।

নন্দলাল এ যুগের ভারতে একজন বড় শিক্ষাগুরু। তাকে বহু ছাত্র ছাত্রীর শিল্পচর্চার জীবনকে গড়ে তুলতে হয়েছে। সে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। এদিকে শান্তিনিকেতনের মত একটা বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রুচির লোকসমাজের মধ্যে থেকে এখানকার নানারূপ সাজসজ্জার রুচিকে একা, একদিকে পরিচালিত করে এসেছেন বৎসরের পর বৎসর।

আজ যে শিল্পচর্চা শান্তিনিকেতনে অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে, সে কাজ একদিন এত সহজ ছিল না। তাকে সহজ করে তুলতে নন্দলালকে বহু বৎসর সাধনা করতে হয়েছে। সেই সাধনার ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনে ও বাইরে বহু শিল্পী কাজ করে চলেছেন। এখানকার শিক্ষার মধ্যে বড় হয়ে শিল্পীরা নন্দলালের মত বড় হোন বা না হোন কিন্তু তারা নন্দলালের শিক্ষাধীনে থেকে যে রুচিবোধ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের

নানা জায়গায় তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে সেইটিই হোলো মস্ত বড় কাজ। এবং যেদিন দেশের মন ভারতীয় শিল্পসাধনার দিকে আরো জাগ্রত হয়ে উঠবে তখন বুঝবে নন্দলালের স্থান কোথায়—এ যুগের এই অভিনয় উৎসব ইত্যাদির দিক থেকে।

রবীন্দ্র-নাট্যের মঞ্চসজ্জার বিকাশে নন্দলালের দান

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটক বা গীতিনাট্য প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে যখনই অভিনীত হয়েছে তখন তার সঙ্গে জড়িত যে সাজে রঙ্গমঞ্চকে আমরা দেখেছি, তা কোনো দেশের প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে যে মেলে না একথা মানতেই হবে। আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চের পিছনে ঘননীল বর্ণের কাপড়। তার ঠিক গজখানেক তফাতে, মঞ্চের দুই ধারে পর পর দাঁড় করানো কাঠের ফ্রেমে আঁটা, গজখানিক চওড়া কাপড়ের দেশী লাল বা গেরুয়া ও ঘন হলদে রঙের দুটি "Wings"। আর দেখি তার মাথায় টান করে আটকানো সেই রঙের কাপড়ের "Fly"। এটিই হোলো এই রঙ্গমঞ্চ সজ্জার মূল ভিত্তি। এরই উপরে রঙীন কাথিয়াওয়াড়ি কাজ করা কাপড়ের টুকরো অথবা নানা প্রদেশের খাঁটি দিশি-শিল্পজাত রঙীন নক্সাকাটা কাপড় দিয়ে নানাভাবে সাজানো কয়েকটি বসবার আসন। কখনো নীচু জল-চৌকী, কখনো কাঠের বাক্স কাপড় ঢাকা দিয়ে ঐ আসন রচনা হচ্ছে। পাশে হয়তো বড় প্রদীপদানি বা ফুলের ঝারি ইত্যাদি সাজিয়ে তাতে একটু বৈচিত্র্য দেওয়া হয়েছে। "Wings" ছাড়া, কখনো কখনো মঞ্চের পিছনের নীল পর্দার মাঝখানে ও ছোট দরজার আকারে ফাঁক রেখে তার চারিদিক নানা প্রকার রঙীন কাপড়ে সাজানো হয়েছে। আবার কখনো এর সঙ্গে কাঠের ফ্রেমে স্থাপত্য কলার ইঙ্গিতও ফোটানো হয়েছে। এক কথায় সমস্ত রঙ্গমঞ্চটিতে উপকরণের আড়ম্বর থাকে যথা সম্ভব কম, স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জা বা সীনের কোন স্থান তাতে নেই। কেবল থাকে এই কয়টি রংয়ের নানারূপ ছন্দ বিন্যাস। যেমন দেশী লাল বা গেরুয়া, হলদে, নীল, কখনো তার মধ্যে সামান্য একটু সবুজ, সাদা ও কালো

রং। রঙ্গমঞ্চের এই ছন্দোময় বর্ণ বিন্যাস আমাদের দেশের একদল সমালোচকের কাছে ভাল লাগেনি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একজন বাঙালী সমালোচক বাঙলা দেশের থিয়েটারের বিষয়ে আলোচনাকালে শান্তি-নিকেতনের মঞ্চসজ্জা বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখেই সেই মনোভাবের পরিচয় পাবো। তাঁর মতে,—

"It looks like a bit of painted canvas of hazy and subdued colour and weired assemblage of unintelligible angles and lines, made to subject if any thing at all something quaint. shadowy and unsabstantial."

তাছাড়া য়ুরোপের futurist tendencies-এর এগুলো ব্যর্থ অনুকরণ বলে তিনি মনে করেন। আরও বলেন—

"The vagueness of their methods in a sense encouraged by the vagueness inherent in the plays of Rabindranath."

এইসব চিন্তাধারা যে কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত তা জানতে হলে আমাদের রঙ্গমঞ্চসজ্জার ঐতিহাসিক ও আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আগে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ভারতবর্ষে নাটক রচনা ও তার অভিনয় যে বহু প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল একথা শিক্ষিত মাত্রেরই জানা আছে। থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ভারতে প্রথম লিখিত গ্রন্থ, ভারতের নাট্য শাস্ত্রের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ ও তার সাজসজ্জা বিষয়ে যতটুক বর্ণনা পাই, তাতে বোঝা যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকেও আমাদের দেশে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার ছিল। আজকালকার মত নাটকের প্রত্যেক অঙ্কে যেমন দৃশ্যপট পরিবর্তন করা হয়, সে ধরনের কোন পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর পাই না আজকাল-কার মত "ড্রপসীন"-এর কোন কথা। নটনটীদের যাওয়া আসার সুবিধার জন্যে যে একটি "যবনিকা" ব্যবহৃত হত তার গায়ে কিছু কিছু দৃশ্য আঁকা থাকত বলে মনে হয়। একটি মাত্র "যবনিকা" থাকার দরুণ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকগণকে কল্পনায় দেখতে হত। এই 'যবনিকা' ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত "কথাকলি" ও "যক্ষগণ" নৃত্যাভিনয়ের "যবনিকা" ব্যবহারে মিল পাওয়া যায়।

সেখানে যে 'যবনিকা' দেখেছি তা অভিনয় মঞ্চের পিছনটার মাপে তৈরী নয় ; তা দশ বারো হাত চওড়া ও লম্বা। কেবল রঙ বেরঙের নক্সা-কাটা দৃশ্যহীন একটি পরদা। প্রধান নটের প্রবেশের সময় তাকে এর দ্বারা আড়াল করে দুটি মানুষ দুদিকে ধরে থাকে। নটের প্রকাশের পর 'যবনিকা' সরিয়ে ফেলা হয়।

প্রাচীন নাটকের রঙ্গমঞ্চে পাহাড় গুহা বিমান অশ্বাদি ব্যবহার হ'ত কিন্তু তা একবারেই আসল জিনিসের হুবহু অনুকৃতি নয়। যাত্রায় ছোট ছোট তীর ধনুকে কুরু-পাণ্ডবের প্রচণ্ড যুদ্ধকে দেখানো হয়, ছোট লাঙ্গলটি কাঁধে ফেলে বলরামের আবির্ভাব হয়, চাটাইয়ের সাহায্যে সর্বাঙ্গ মুড়ে ভূত প্রেতকে যাত্রার আসরে দেখেছি। ছোট একটা পর্বতের মত কিছু একটা হাতে করে হনুমান যাত্রার আসরে গন্ধমাদন বহন করে। ঐসব জিনিসগুলিকে সে যুগে এই আদর্শেই ব্যবহার করতো। এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন পদ্ধতির সব নাটকেই এই আদর্শ এখনো বর্তমান।

একথা ঠিক যে তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চকে সাজানো হতো কিন্তু সে সাজের সঙ্গে নাটকের কোন দৃশ্যের বা উল্লিখিত নাটকের বিষয় বস্তু যে স্থান অবলম্বনে লিখিত, তার কোন পরিচয় ফোটান হতো না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা পড়ে মনে হয় যে সে যুগের লোকেরা সাজে মঞ্চকে এমন একটি বিশিষ্টতা দিতেন যে, দেখে মনে হতো যেন মঞ্চটি কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে সজ্জিত। এই অভিনয় স্থানকে বৈশিষ্ট্যদানের ইচ্ছা থেকেই মঞ্চসজ্জার আয়োজন। কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এতে ছিল না। বৈশিষ্ট্যদানের প্রকাশ স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে নানা রূপ রঙীন কারুকার্য ও আলপনা ইত্যাদি দেখা যেত। সে সাজের সঙ্গেও নাটকের বিষয় বস্তুর কোন সাদৃশ্য ছিল না। রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই বিশিষ্টতাটি চীন ও জাপানের প্রাচীন নাটকের আদর্শ। তাদের প্রাচীন নাট্যকলায় রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় তারা একই আদর্শ মেনে চলে। চীন দেশের আদর্শে বলা হয়েছে,—

"Decoration is usually considred as an external of the drama. To the Chinese, scenery is a silly and unnecessary bother............scenic decoration of any importance were always out of question in the Chinese theatre."

জাপানের প্রাচীন "নৌ" নাট্যের রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বলা হয়েছে,—

"No does not seek to represent realistically.........in the No Play there is no scenery, stage fixtures are of the simplest......The fixtures are intended to suggest and not to be realistic."

চীন ও জাপানের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের তিন দিক খোলা থাকে, অর্থাৎ দর্শক তিন দিকেই বসে অভিনয় দেখে। সেখানেও রঙ্গমঞ্চকে অলংকৃত করা হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে নাটকের স্থান কালের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সেখানেও মঞ্চটিকে সাজানো হয়েছে কেবল মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য দেবার জন্যে। যে বৈশিষ্টদানের আদর্শে আমরা পূজার বেদী ও উৎসবদিনের প্রাঙ্গণ, ঘর বাড়ী পথ ইত্যাদি সাজাই।

প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত নাট্যশালার একটি নমুনা আমি দেখেছি দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের একটি বিখ্যাত মন্দিরে। আজও তাতে পেশাদারী অভিনেতা সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় নাটকের অভিনয় করে। সেখানকার অভিনয়-গৃহ ও তার রঙ্গমঞ্চ ও সাজসজ্জার প্রকৃতি ও আদর্শের সঙ্গে ভরত বর্ণিত বা চীন জাপানের প্রাচীন থিয়েটার ও তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আদর্শে মিল লক্ষ্য করেছি। প্রকাণ্ড মঞ্চ গৃহের পশ্চিম দিকে স্থাপিত পূর্বমুখী রঙ্গমঞ্চটি। মঞ্চের তিন দিক খোলা। সেই তিন দিকেই দর্শকরা বসে। কারুকার্যময় কাঠের সরু থামে মঞ্চটি সীমাবদ্ধ ও কারুকার্যময় কাঠের আচ্ছাদনে মঞ্চের উপরটি আচ্ছাদিত। পিছনে লাগা সাজ-ঘর। সেখান থেকে দুটি দরজা দিয়ে তারা মঞ্চে প্রবেশ করে। এইখানেও বহু শত বৎসর ধরে অভিনয় কলা সম্পন্ন হচ্ছে কিন্তু কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যসজ্জার কথা এরা কখনো চিন্তা করেনি; আজও করে না। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হলেও চীন, জাপান ইত্যাদির মত "ড্রপসীন"-এর ব্যবহার এদের মধ্যেও নেই।

বাস্তব দৃশ্যের সমর্থন এরা করেনি বলে যে এই মঞ্চকে একেবারে নিরলংকার করে সাজিয়েছে তা নয়। তাকে অভিনয় স্থান হিসেবে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে নয়নরঞ্জন করে সাজিয়ে।

রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ স্থানরূপে অলংকৃত করবার পিছনে যে চিন্তা কাজ করেছে সেটিকেও আমাদের জানা উচিত। এই যে সাজসজ্জা, এর

প্রকৃত উদ্দেশ্য হোলো স্থানটির প্রতি দর্শকের মনে একটি অনুকূল ও সহৃদয়তার ক্ষেত্র রচনা করা। পূজার স্থান, উৎসব বেদী বা প্রাঙ্গণ সাজানোর ভিতর দিয়ে আমাদের মনের উপর যে ক্রিয়া করে এরও আসল উদ্দেশ্য তাই। সেইরূপ সজ্জিত রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন নট নটীরা স্থান নেয় তখন তারাও একটি বিশেষ রূপ নিয়েই দর্শকের চোখে উজ্জল হয়ে ওঠে। একেও বলা চলে কতকটা স্থান মাহাত্ম্য। এদিকে নট নটীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে এমনভাবে দর্শকদের মন ও চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় যে যতক্ষণ মঞ্চে নট নটীরা অভিনয় করছে ততক্ষণ তার কথা একটুও মনে আসবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে অভিনেতারা নেই সেই মুহূর্তেই সে নিজের স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুর্য নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির। অভিনেতারা এতক্ষণ যে রসের সৃষ্টি করে গেল তাতে সে রস ব্যাহত হল না একটুও। তখন মনে হবে যে-সাজে রঙ্গমঞ্চ সেজেছে সে সাজটি যেন নাটকের সব রকম রসেরই অনুকূল।

রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই দৃষ্টি-ভঙ্গী বা আদর্শটিকে ভারত ও এশিয়া মহাদেশ এতকাল প্রতিপালিত করে এসেছিল। কিন্তু এ যুগে য়ুরোপের সভ্যতার চাপে তাদের আদর্শ আমরা নিতে বাধ্য হলাম। আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরে থিয়েটারের যে চলন দেখি এ সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপের আদর্শ উদ্ভূত এবং এর রঙ্গমঞ্চের সাজও সম্পূর্ণরূপে সেই পথেই আত্মনিবেদন করেছে। অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা বা সীন অথবা যন্ত্র সাহায্যে রঙ্গমঞ্চকে নাটকের বর্ণনা অনুসারে যথাসম্ভব বাস্তবমুখী করবার দিকেই প্রবল চেষ্টা। নট নটীদের অভিনয়কালে এই দৃশ্যসজ্জা প্রবলভাবে দর্শকদের চোখে ভাসতে থাকে, সব সময় মনে করিয়ে দিতে চায় সে আছে। কিন্তু স্থিতিশীল কোন বিশেষ দৃশ্য অভিনেতাদের চলনশীল হৃদয়াবেগের নানা প্রকাশের সঙ্গে খাপ খায় কিনা তা চিন্তার বিষয়।

বাঙলা দেশ য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চের সাজকে গ্রহণ করেছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই; কলিকাতাবাসী য়ুরোপীয়দের থিয়েটারের অভিনয় দেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশে পেশাদারি থিয়েটার স্থাপনের পর থেকেই সে আদর্শ কার্যকরীভাবে দেশের অভিনয় বা নাট্যকলার উপর প্রভাব বিস্তার করলো। 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয় মেলা' আন্দোলনের যুগেই এর আরম্ভ।

এই আন্দোলনের প্রভাব কলিকাতাবাসী বাঙালী সমাজেই প্রথম প্রবলভাবে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় গুরুদেবের পরিবারও এই প্রভাবের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। এই পরিবারে যখনি নাটকাদির অভিনয় হয়েছে তখন য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চ সজ্জার প্রতি তাঁদের কি প্রকার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের পরিবারে অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার নাটকের দৃশ্যসজ্জার বর্ণনা থেকেই তা ধরা পড়বে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অভিনয় ইত্যাদি কলার একজন প্রধান উৎসাহী? তখনকার কালে এই পরিবারের যাবতীয় অভিনয়ের পিছনে এঁরই উৎসাহ বিশেষভাবে কাজ করতো। নিজেও এক সময় কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন; গুরুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়দের দিয়ে নাটক রচনা করিয়ে তা অভিনয়ও করিয়ে ছিলেন। পরিবারের অভিনয় আন্দোলনের প্রথম যুগের দৃশ্য সজ্জার কিছু বর্ণনা তাঁর কোন কোন লেখায় আমরা আজও যা পাই তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। তাঁর নিজের রচিত একটি নাটকের অভিনয় কালে তাঁদের বাড়ির—"দোতালার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া............ সীন আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপসীনে, রাজস্থানের ভীম সিংহের সরোবর তটস্থ জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল।......তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজ যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন-খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতিসুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।"

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ সময়কার রঙ্গমঞ্চের বিষয়েও একই কথা লিখেছেন,—

"সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রাস্তা; স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিস্টিক হোতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, অন্ধকার বনের পথ,..... সেই বনের সীন এলেই বাবামশায় অন্ধকার

বনপথে জোনাক পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন। ড্রপসীন পড়ল তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা, রাজপুত্তুর নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার, গ্রীক যুদ্ধের একটি কপি। কোনও সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়ে ছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো থেকে গোলাপফুলের মালা ঝুলছে ; কী ভালো যে লেগেছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।"

অপর একটি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু লিখেছেন—

"ঝড়বৃষ্টির একটি দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টি ধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল।"

এর পরে এলো গুরুদেবের নাটকের যুগ। প্রথম নাটক "বাল্মীকি প্রতিভা।" অবনীন্দ্রনাথ এর বর্ণনায় লিখেছেন,—

"হ, চ, হ, এলেন সেবারে তাঁর উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে তুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হলো। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সীন আঁকলেন কচু বনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে।…আর বাগান থেকে বটের ডাল পালা এনে লাগিয়ে দিলেন।'- আর একবার এই নাটকের অভিনয়কালে……

"মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন।……… বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতালার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সীন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্ম বন, শোলার পদ্মফুল পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।"

"তখন এ-রকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হলো। লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজটা সাজানো হোলো।"



নৃত্য

চিত্রকর: শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

……"তার পর বৃষ্টি হোলো স্টেজে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।' পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়্‌কড়্ ক'রে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দম্বেল ছিল……নিতুদা দোতালার ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এধার ওধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহাখুশী, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়েলিস্টিক্ করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।……ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে 'দিনু' স্টেজে এল। একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাসও খাওয়ালে। সে কী অ্যাক্টিং যদি দেখতে।"

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে প্রথম যেবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয় সেবারেও স্টেজ খাটানোয় কলকাতার প্রভাব দেখা গেছে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইবারের নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনায় লিখেছেন—

"স্টেজ তৈরি করার জন্য যদিও খানকয়েক নড়বড়ে তক্তপোষমাত্র ছিল আমাদের সম্বল, তবু 'সিন' আঁকবার জন্য কলকাতা থেকে একজন শিল্পীকে আনানো হ'ল। তাঁর হাতের তুলি ছিল মুক্তগতি, আর তিনি দুটানে ছবি যা আঁকতেন তা হত একেবারে কিম্ভূৎকিমাকার……তাঁর জবড়জঙ্গ চিত্রবিদ্যায় আমরা বরং রীতিমত বিমুগ্ধ হয়ে স্টেজ বাঁধতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম।……দৃশ্যপটে রুচির অভাব যতই থাক, অভিনয় মোটেই খারাপ হয় নি।"

এর পরে শান্তিনিকেতনের দৃশ্যসজ্জায় একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়—তার প্রথম সূত্রপাত হোলো "শারদোৎসব" নাটকটি অবলম্বন করে এবং এর জের চলেছিল "অচলায়তন" এবং "ফাল্গুনী" পর্যন্ত। এই পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' এবং 'ফাল্গুনী'—শান্তিনিকেতনে এই তিনটি নাটকের অভিনয়কালেই চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করা হয় এবং তার পরিবর্তে এল স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রয়োজন", অর্থাৎ গুরুদেবের নাটকে সীন আঁকা দৃশ্য-পট এইবারেই প্রথম ত্যাগ করা হল। স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা হোলো, রঙ্গমঞ্চের

পিছনে মাটির ঢিবি, ঘাসের চাপড়া, কাশের বন, সিউলির গাছ, শরৎকালের নদী রচনা করে একটি বাস্তব চিত্র রচনা। এই পদ্ধতির দৃশ্যসজ্জা ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবের অভিনয়ে দেখেছি। আর দেখেছি মঞ্চের সামনে শিল্পগুরু নন্দলাল পরিকল্পিত নটরাজের চিত্র আঁকা প্রকাণ্ড একটি "ড্রপসীন"।

এই "ড্রপসীন"টি জরাজীর্ণ হয়েছিল বলে এইবারের শারদোৎসবে অভিনয়কালে নন্দলাল আর একটি "ড্রপসীন" এঁকেছিলেন। তাতে ছিল শরৎকালের একটি দৃশ্য—অলংকরণ রীতিতে আঁকা। এইটিই বিদ্যালয়ের অভিনয় জীবনের শেষ "ড্রপসীন"।

এই কয়টি নাটক লেখার মূলে ছিল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের আদর্শ। অর্থাৎ যেখানে ছাত্ররা বিশ্বপ্রকৃতির আবেষ্টনে মন ও দেহকে তৈরি করবে। তাই মঞ্চসজ্জায় ও প্রকৃতিকে ছবির মত পিছনে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। রিয়েলিস্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গি তখনও প্রবল।

প্রথমবার 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ের কিছু আগে থেকেই গুরুদেবের মনে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তার উদয় হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। তাতে লিখেছেন, "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।......

"ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কে? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।......

"দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া

শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্যে ভালো লাগে।...... মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে—একা মালিনীরই মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে।

"য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্ত রঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে।

"তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।......

"প্রাচ্য দেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল সহজ।—...... আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য;—......"দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরব-দান করিলেই সহৃদয় হিন্দু সন্তানের মতো কাজ হয়।......

"বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে......।"

সীন আঁকা দৃশ্যসজ্জা পরিত্যক্ত হ'ল কিন্তু দৃশ্যসজ্জায় বাস্তবিকতা পরিত্যক্ত হ'ল না। গাছ গাছড়ার সাহায্যে দৃশ্যসজ্জা শান্তিনিকেতনের ঋতু নাটকগুলিতে রয়ে গেল। এই সাজ সজ্জার প্রকৃত শিল্পরুচী

প্রকাশিত হয় নি বটে, তবুও তখনকার আশ্রমবাসীদের কাছে তা একটুকু ঠেকেনি। 'ফাল্গুনী'তে দোল্না বেঁধে তাতে দুলতে দুলতে গান "ওগো দখিন হাওয়া', এর একটি ভাল উদাহরণ। যেন বসন্ত-কালে প্রস্ফুটিত ফুলের বাগানে দোলনা চড়ে একটি বালক গাইছে। শান্তিনিকেতনে ১৯১৯।২০ সালে যখনি "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় হয়েছে তখনও প্রচুর ডালপালা দিয়ে স্বাভাবিক বনদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। তবে কলকাতার যুগের মত অতটা রিয়ালিস্টিক্ করা সম্ভব হোতো না।

এরই মধ্যে ১৯১৬তে "ফাল্গুনী" ও ১৯১৭ "ডাকঘর" কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হোলো। এই সময়টি হোলো জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" সংঘের যুগ। যেখানে গুরুদেব, গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নন্দলাল ও অসিত হালদার, সুরেন কর ইত্যাদি শিল্পরসিকরা মিলে ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও রুচিকে মানুষের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কিভাবে মেশানো যায় তার অনুশীলনে চিন্তায় ও কর্মে মগ্ন ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ সজ্জাও এই সংঘের কার্যসূচীতে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এর কাজ তাঁরা শুরু করেছিলেন গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে। "ফাল্গুনী" ও "ডাকঘর"-এর মহড়ার সঙ্গে এই শিল্পীবৃন্দ প্রতিদিন একটু একটু করে রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। এখানে আঁকা সীন তাঁরা ব্যবহার করেন নি ; কিন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার আয়োজন ছিল।

তবুও এই সময় মঞ্চসজ্জায় একটি বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হোলো নীলরঙের কাপড় টানিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড রচনা করে। অবনীন্দ্র-নাথের ভাষায় এর একটু বর্ণনা তুলে দিচ্ছি। "ফাল্গুনী" রঙ্গমঞ্চের বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

"স্টেজ সাজিয়েছিলুম দোলাটোলা বেঁধে।......ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হোলো সেই বাল্মীকি-প্রতিভার নীল রঙের মখমলের বনাত, দেখতে হোলো যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাচ্ছে।.....বাদাম গাছের ডালপালা এনে কিছু-কিছু এখানে-ওখানে দিয়ে দিয়ে স্টেজ সাজানো হোলো।......বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম। উপরে একটু ডালপালা দেখা যাচ্ছে, মনে

হতে লাগল যেন উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা টাঙানো হয়েছে।"

মঞ্চের ব্যাকগ্রাউণ্ডে প্রথম নীল রঙের মখমলের বনাত টাঙাবার ইতিহাসটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য। নাটকের মহড়ার সময় সব শিল্পীরাই উপস্থিত থাকতেন—তা ছাড়া তাঁরা অনেকে নাটকে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদেব যখন অন্ধ বাউলের অভিনয়ে 'ধীরে বন্ধু গো' গানটি গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে অন্তরালে চলে যেতেন তখন শ্রোতাদের মনে গানের সুরে, ভাবে ও অভিনয়ে একটি বিশেষ রসাবেশের সৃষ্টি করতো। তাতে শিল্পীবৃন্দের মনে প্রশ্ন জাগলো অন্ধকার নিশীথের মধ্যে বহুদূরে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দৃশ্যসজ্জায় কোথাও ফুটিয়ে তোলা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই ঘন নীল পর্দার সূত্রপাত। তাতে দূরত্বের ছাপ দিতে গিয়ে রূপালী চাঁদের ফালি এক কোণে লাগানো হয়। মঞ্চের সামনে ফুল সমেত আসল পলাশ গাছের ডালও দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এই দৃশ্য-সজ্জায় বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল পর্দায় যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল, তার সঙ্গে পলাশ গাছের ডালটি ও দোলনাটি মানানসই হয়নি।

১৯০২ সালে "রঙ্গমঞ্চ" প্রবন্ধে, সাজসজ্জা নিয়ে গুরুদেব যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই কথাই তাঁকে আর একবার বলতে হোলো ১৯১৬ সালে 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের পরে। এবারে তিনি তাঁর বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় বললেন অন্য প্রদেশবাসীদের ইচ্ছায়। বললেন আমাদের রঙ্গমঞ্চ 'imaginative', য়ুরোপের হল realistic। এ ছাড়া আরও বললেন,—

"The theatre which we have set up in India today, in imitation of the west, are too elaborate to be brought to the door of all. In them creative richness of the poet and the player is overshadowed by the mechanical wealth of the capitalist. If the Hindu spectator has not been too far infected with the greed for realism: if the Hindu artist has any respect for his own craft and

skill : the best thing they can do for themselves is to regain their freedom by making a clean sweep of the costly rubbish that has accumulated and is clogging the stage of the present day."

এবারেও তিনি শিল্পীবৃন্দকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় কোন্ পথ নেওয়া উচিত তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিচিত্রা সঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দের কাজে সেই প্রভাব কার্যকরীও হয়েছিল।

কলকাতায় অভিনীত 'ফাল্গুনী' ও ডাকঘরের' অভিনয়ের মঞ্চসজ্জায় বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে খানিকটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা যে হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। ডাকঘরের সময় শিল্পীবৃন্দ একত্রে চিন্তা করে মঞ্চের উপরে সত্যিকার খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি কুটীর বানান। এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'দরমা, চালা বেঁধে, গোবর মাটি লেপে আলপনা কেটে, সিঁকেতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে, মাটির পিলসুজে প্রদীপ রেখে রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব শ্রী ফুটিয়ে তোলা হোলো।.........পিছনের যবনিকার একপ্রান্তে নীলপর্দায় উজ্জ্বল রূপালী কাগজ মেরে চাঁদের প্রতিকৃতি করে দেওয়া হল।'

ডাকঘরেও নীলপর্দা ও চাঁদের ফালি লক্ষ্যণীয়।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর শুরু হোলো আর এক ধরণের বর্ষাঋতুর গীত আসর, গুরুদেব যার নামকরণ করলেন 'বর্ষামঙ্গল'। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রথম বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হোলো। বিরাট মঞ্চের তিন দিকে ছিল শ্রোতাদের বসবার জায়গা। মঞ্চের পিছনে ছিল কেবলমাত্র একটি নীলপর্দা—আর ছিল তার গায়ে আঁটা কাগজের এক সারি পাখা মেলে উড়ে-যাওয়া বক। আর কিছু ছিল না। মঞ্চ ছিল বর্ষার নানা ফুলে সজ্জিত। গায়ক-গায়িকাদের গলায় ছিল বর্ষাকালীন ফুলের সুগন্ধি মালা। এতখানি সরল ও অলঙ্কার বিরল করে ফেলা হোলো মঞ্চকে। শান্তিনিকেতনেও প্রায় সব উৎসবই এই ভাবে অলংকার বিরল ও কেবলমাত্র ইঙ্গিতপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে সম্পন্ন হতে লাগল।

শরৎ ও বসন্ত ঋতুর উৎসবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আম্রকুঞ্জকে একটু বিশেষভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে মাত্র। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন

ও কলকাতায় যখন আর একবার পরপর পরিবর্তিত আকারে শারদোৎসবের অভিনয় হোলো তখন দেখা গেল, রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আর একটি নতুন রূপ। এই রূপের বৈশিষ্ট্য হোলো কেবলমাত্র রঙ্গীন কাপড়ের বর্ণচ্ছটা। গাছ-পালা, ইত্যাদির দ্বারা শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের স্বাভাবিক দৃশ্য রচনার ধারাও পরিত্যক্ত হল এখন থেকে। সবটাই গতি নিল রংয়ের সহজ সরল অলংকরণের দিকে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যত রকমের নাটক শান্তিনিকেতনে কলকাতায় বা বাইরে অভিনীত হয়েছে, তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জাও রচিত হয়েছে একই আদর্শকে ভিত্তি করে। এই যুগটিকে গুরুদেবের নাটকের সঙ্গে জড়িত রঙ্গমঞ্চ সজ্জার তৃতীয় যুগ বলব। প্রথম হোলো জোড়াসাঁকো বাড়ির যুগ, দ্বিতীয় যুগ হল শান্তিনিকেতনের প্রথম কুড়ি বৎসর। ঐ শেষ যুগটির প্রবর্তক হলেন শিল্পগুরু নন্দলাল। আরম্ভেই সংক্ষিপ্তাকারে রঙ্গমঞ্চ সজ্জার যে বর্ণনা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেইটিই হোলো তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রচলিত গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ সজ্জার মূল ভিত্তি। তিনি এ পথে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই আদর্শের মধ্যে নিজেকে তিনি বদ্ধ রাখেননি। তিনি গুরুদেবের উৎসাহ ও প্রেরণায়, তাঁরই ইচ্ছামত রঙ্গমঞ্চকে সাজাতে গিয়ে কতখানি সহজ, সরল অথচ একটি বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তারই চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই কাজে রঙের ছন্দোময় বিন্যাসই পেল প্রাধান্য। তাতে এনে দেয় মনে একটি স্নিগ্ধতা, গভীর শান্তি। তা দুর্বল রসমুগ্ধতায় মন ভোলায় না, মনে জাগে বিরাটের মাধুর্য। এরই আবেষ্টনে দাঁড়িয়ে নট ও নটীরা যখন অভিনয় করে তখন সেই রঙ্গমঞ্চের সাজ-সজ্জা আলাদা করে নিজেকে জাহির করে না। এ যেন ভারতীয় ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড। আছে কি আছে না ছবি দেখার সময় বোঝবার যো নেই। শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত এই রঙের বিন্যাসেও আমরা দেশি ছবির আদর্শ লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে যে কয়টি রঙ প্রধান, এই মঞ্চসজ্জায় তিনি সেই রঙগুলিকে বিশেষ করে ব্যবহার করেছেন। রঙের বিন্যাসেও তিনি সেই ধারাকেই প্রাধান্য দিলেন। রঙগুলিকে সাজানোর আরও একটি কারণ ছিল। নীল রঙের পর্দার

সাহায্যে দূরত্বের যে ইঙ্গিত জেগেছিল, তাকে আরও মধুর করে প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই অন্য রঙগুলি স্থান পেল। নীলের বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েই শিল্পগুরু মঞ্চের সামনে হলদে ও লাল রঙকে বসালেন।

অনেক সময় এই প্রশ্ন মনে উঠতে পারে যে, গুরুদেবের একমাত্র রিলিফ ধর্মী নাটকেই এইরূপ মঞ্চসজ্জা উপযুক্ত। সামাজিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত ড্রামাটিক পরিবেশের নাটকের জন্যে এ নয়। কিন্তু এই আদর্শের মঞ্চ পরিকল্পনা গুরুদেবের উভয় পদ্ধতির নাটকে ব্যবহৃত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব রকম নাটকের পক্ষেই উপযুক্ত।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন পুরাতন নাটক 'বিসর্জন' অভিনীত হোলো, স্বয়ং গুরুদেব যাতে অভিনয় করলেন, তারও মঞ্চসজ্জা শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত আদর্শকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। প্রথম ও মধ্য যুগের রিয়েলিস্টিক দৃশ্যসজ্জার কথা কারুরই মনে জাগেনি। পরে 'নটীর পূজা' ও ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে 'তপতী'র মত নাটকেও আমরা একই আদর্শকে ভিত্তি করে রঙ্গমঞ্চ সাজাতে দেখলাম। এখানে স্থাপত্যকলার যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল, তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা কাজ করে। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা মূল ধারার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেই প্রকাশিত।

এ ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার কথা ওঠা স্বাভাবিক মনে করে গুরুদেব পূর্বেই সতর্ক হয়ে তপতীর ভূমিকায় দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে আর একবার সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের সাবধান করেছিলেন। এই ভূমিকাকে ১৯০২ ও ১৯১৬ সালের মন্তব্যের প্রায় পুনরুল্লেখ বলা চলে। কিন্তু এখানে আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তপতীর ভূমিকায় বললেন—

"এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধন দৃশ্যপট একদা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে

থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্টাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

আজকাল বিজলী বাতির যুগ, রঙ্গমঞ্চের আলোক-সজ্জার নানারূপ উপায় য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে তার সদ্ব্যবহারও হচ্ছে। শান্তিনিকেতনও সেই পথের সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু আলোর এতটা কারিকুরি এই সব নাটকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে আলোর ভিতর দিয়েও সেই সব মূল রঙের ছন্দময় বিকীরণই প্রাধান্য পেয়েছে। তা ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ঘন ঘন রঙের পরিবর্তনে অর্থহীন রঙের খেলা দেখানোই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। এখানেও আলো ফেলার রীতি সহজ ও সরল। সাধারণত অ্যাম্বার লাল ও নীল এই ক'টি রঙই অভিনয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙে ও অভিনেতাদের সাজের রঙেও আলোর রঙে একটি বর্ণসাম্য যাতে ঘটে, শিল্পী নন্দলালের সেই ছিল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটিকে ভারতের শিল্পরুচি ও আদর্শজাত একটি খাঁটি জিনিস এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সুতরাং এই মঞ্চসজ্জা বিদেশী শিল্পদৃষ্টির ব্যর্থ প্রকাশ বা অনুকরণ এ কথা কোনমতেই বলা চলে না। এ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত আমাদেরই শিল্পীর একটি বিশেষ সৃষ্টি, যা গুরুদেবের প্রভাবে ও শিল্পগুরুর চেষ্টায় আমাদের দেশে এ যুগের রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় একটি যুগ প্রবর্তন করেছে।

হিমালয়ের পথে

১৩৪৯ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হঠাৎ প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, কয়েকদিনের মত। শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসীন্দাদের মধ্যে আমিও এই গরমে এবার এখানেই নির্বিঘ্নে ছুটী ভোগ করব ঠিক করেছিলাম। মন সর্বদাই ছিল সেদিনের জগতের সর্বব্যাপী প্রলয়ের সংবাদে এবং ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তনের নিদারুণ করুণ কাহিনীর কথায় ভারাক্রান্ত, সেই সঙ্গে নিজেদের অসহায়তার ও অক্ষমতার বেদনা যেন আরো তীব্রতরভাবে অনুভব করছিলাম। গরমে ও এই মনোভাবের আবেষ্টনে পড়ে কেমন যেন আলস্যে দিনগুলি কাটছিল। এই রকম অবস্থার মধ্যে একদিন বিকালে শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু যিনি আমাদের সকলের "মাস্টার মশায়" নামে পরিচিত, জানালেন তিনি আলমোড়া যেতে ইচ্ছুক হয়েছেন, আমাকেও প্রস্তুত হতে। সঙ্গে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক মাসোজীও আছেন। মাস্টার মশায় আলমোড়া বা হিমালয়ের এই অঞ্চল পূর্বে দেখেন নি, আমিও ইতিপূর্বে উত্তর ভারতের হিমালয়ের কোন পাহাড় দেখিনি। কিন্তু শ্রীযুক্ত মাসোজী একজন অতিশয় সুদক্ষ হিমালয় পর্বত-পর্যটক, তিনি গত ২০ বৎসর যাবৎ কাশ্মীরের অমরনাথ থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চল আসামের সব বিখ্যাত পাহাড়ের সঙ্গে পরিচিত। তিনি কেদার বদ্রী দেখেছেন দুবার। কৈলাস, মানস সরোবর দর্শনও তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে। তাঁর এই সব বিচিত্র ভ্রমন-কাহিনী শোনবার মত। যাই হোক তিনিও সঙ্গে আছেন শুনে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মনের নির্জীবতাকে এই উপলক্ষে ঝেড়ে ফেলবার এই একটা সুবিধা পেয়ে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। হিমালয়ে আলমোড়া ভ্রমণ এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কত শত ভ্রমণকারী, আজকালকার জগতের গর্ব মোটর গাড়ির সাহায্যে নির্ভাবনায় সেখানে যাচ্ছে আসছে, তবুও নতুন হিমালয় দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যে আনন্দ বোধ করেছিলাম তার কারণও কতগুলি আছে। কৈলাস ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যখন পড়তাম তখন তাতে আলমোড়ার কথা শুনেছি; স্বামী বিবেকানন্দের

নির্জন আশ্রম মায়াবতীর নাম শুনেছি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পূর্বে ধারণাই করতে পারিনি—আলমোড়া শহর ও মায়াবতীর ব্যবধান কতদূর। যাই হোক সেকথা পরে আসবে। তারপরে সম্প্রতি আলমোড়ায় আমার পক্ষে আরো বড় আকর্ষণের বস্তু ছিল উদয়শংকরের বিখ্যাত নৃত্যের আশ্রমটি।

আমাদের যাত্রা শুরু হোলো। মাস্টার মশায় সমেত আমরা তিনজন, বোলপুর থেকে বরাবর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে ভারতবর্ষীয় রেল কোম্পানীর গাড়িতে যাতায়াতের যে আরাম তা ভারতবাসীকে লিখে বোঝাবার কিছুই প্রয়োজন করে না। মাস্টার মশায়ও আমাদের সহযাত্রী। তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে; এই বয়সে এই শ্রেণীতে এতদূরের ভ্রমণ তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাবেন। বর্ধমান থেকেই আমাদের যাত্রার কঠোর অভিজ্ঞতা শুরু হোলো। যে কামরায় আমরা বহুকষ্টে স্থান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, দুর্ভাগ্য বলি কিম্বা সৌভাগ্য বলি, সেই কামরাটি ব্রহ্মদেশ পলাতক দুঃস্থ ভারতবাসীতে পূর্ণ। কেবলমাত্র দুই প্রবেশ পথের মাঝে আমাদের মোট ইত্যাদির জন্যে কোনপ্রকারে স্থান জোগাড় করে আমি ও মাসোজী ঠেসান দিয়ে দাঁড়াবার স্থান পেলাম—মাস্টার মশায়কে বয়স্ক দেখে বোধ হয় তারা কোনরকমে একটু বসবার স্থান ছেড়ে দিল। বর্ধমান থেকে সমস্ত রাত্রি আমাদের এইভাবেই কাটাতে হয়েছিল। এই বয়সে মাস্টার মশায়ের তৃতীয় শ্রেণীর এই ভীড়ের কষ্টসহন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এই দলের মধ্যে কয়েকজনের ব্রহ্মদেশে নানাপ্রকার ছোটখাট ব্যবসা ছিল, অন্যরা সেখানে চাকর, দারোয়ান, মেথর ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতো। বহুদিন ধরে তারা হেঁটে এসেছে বহু দুঃখকষ্ট অনাহার অর্ধাহারের মধ্য দিয়ে। প্রায় সকলেরই শরীর শীর্ণ, চক্ষু কোটরাগত। দেহ ও দেহের বস্ত্র মলিন, স্নান নেই। মাথার চুল ধূলায় ও যত্নের অভাবে উস্কোখুস্কো পাগলের মত হয়ে আছে। শরীরে বল নেই, তাই কয়েকজন বেঞ্চিতে শোবার জায়গার অভাবে ট্রেনের ধূলিমলিন মেঝের উপর নানাপ্রকার আবর্জনার মধ্যে আধমরার মত শুয়ে আছে।

দেখলাম উঠে বসবার মত মনের ও শরীরের শক্তি ক্ষীণ। মাঝে মাঝে স্টেশন থেকে খাদ্য আহরণ করবার আগ্রহে কোনপ্রকারে উঠে জল ও খাদ্যের দ্বারা নিজেকে ঠাণ্ডা করে' আবার শুয়ে পড়েছে। এই দলের সকলেই একই স্থানের বাসিন্দা না হলেও দেড় মাস দুমাস নানা দুঃখে সুখে একই পথের সাথী হিসেবে চলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে একটা গভীর ভালবাসা জন্মেছিল সেইটি আমার কাছে ভাল লেগেছিল। এই দলে হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল, কিন্তু দুঃখের দিনে সকলেই বুঝেছিল যে দেশে যখন বিপদ আসে তখন এইভাবে নির্বিচারেই আসে, কোন ধর্ম বা জাতের দোহাই সে মানে না। একটি অতিবৃদ্ধ হিন্দু পাঞ্জাবী, মাস্টার মশায়ের পাশেই তাঁর দিকেই পা রেখে বেঞ্চে শুয়েছিল। গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে, স্টেশনে মুসলমান পানিপাঁড়েকে দেখতে পেয়ে জল চাওয়া হোলো। মধ্য-প্রদেশের একজন যাত্রী বলে উঠলো "ও মুসলমান পানিপাঁড়ে", কিন্তু বৃদ্ধটি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে "ধেৎ তেরি মুসলমান" বলে সেই জল নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো। রাত্রে মাস্টার মশায় যখন বসে বসেই কোনপ্রকারে ঘুমের চেষ্টা করেছেন, তখন দেখতে পাচ্ছি তাঁরই পাশের দুর্বল বৃদ্ধটির শীর্ণ পদদ্বয় মাঝে মাঝে তাঁর গায়ে ঠেক্‌ছে, কখনও সেই স্পর্শ সজোরে এসে উভয়কেই সচেতন ক'রে দিচ্ছে। তথাপি মাষ্টার মশায় নির্বিকার। বরঞ্চ বৃদ্ধের ঘুমের সুবিধা করতে গিয়ে তিনি নিজে একটু এগিয়ে এসে বেঞ্চের ডগায় কোন রকমে বসে, বৃদ্ধের পাদুটি তার পিছন দিয়ে লম্বা ক'রে ছড়িয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি বহুবার বৃদ্ধের পাদুটিকে সতর্ক করেও কৃতকার্য হতে পারিনি, দু' একবার বৃদ্ধকেও সাবধান করেছিলাম, কিন্তু ঘুমের অচেতন অবস্থায় এসব কথার কি মূল্য আছে। বৃদ্ধের এই অসাবধানতায় মনে মনে বেশ একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের মুখের ভাবে কোনপ্রকার বিরক্তির আভাস না পেয়ে নিজেই লজ্জিত হলাম। এই বৃদ্ধ দুর্গতের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তিনি নিজে অনায়াসে সহ্য করে গেলেন, তার ঘুমের একটুও ব্যাঘাত করেন নি।

এইভাবে রাত কাটিয়ে পরের দিন যখন একটু জায়গা পাওয়া গেল, তখন মাস্টার মশায়কে শোবার মত একটু জায়গা করে দিতে পেরেছিলাম।

দুপুরে আমাদের গাড়ি মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড গরমের মধ্য দিয়ে গরম বাতাসকে আরো ঘুলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছিল, তখন সেই গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ভিজে গামছায় মুখ চোখ ঢেকে বসে আছি। সে দেশবাসীদের মত এরকম লু ছোটা গরমে অভ্যস্ত নই বলে এই প্রথায় অনেকটা আরাম পেয়েছিলাম। দুপুরে হঠাৎ জানা গেল ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের মধ্যে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ রোগা একব্যক্তি উত্তর ভারতের কোন ভাষা জানে না এবং সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় তার বাড়ি, সে গাড়ির অন্য কেউ তা বলতেও পারে না। ভাষা না বুঝতে পেরে অন্যান্য সকলে তাকে বাঙালী ভেবেছে। আমাদেরও মনে কৌতূহল হোলো, তাকে মাস্টার মশায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে যা উত্তর দিল, তার কোন অর্থ কারুরই বোধগম্য হোলো না। কারণ তার ভাষা আমাদের উত্তর ভারতীয় কোন ভাষার সঙ্গেই মিললো না। আন্দাজে ধরতে পারলাম সে দক্ষিণভারতীয়। তার চেহারার মধ্যেও সেই ছাপ ছিল। যাই হোক মানুষ তো—তাই আকারে ইঙ্গিতে ও অনুমানে প্রথমে ধরা গেল সে অন্ধ্রদেশবাসী। বহুদিন যাবৎ বর্মাদেশে মেথরের কাজ করতো, সে যাবে "নেলোর" শহরে। হাওড়া স্টেশনে যখন সে "নেলোর" যাবার কথা বলে, তখন তাকে এ গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। "নেলোর" ভুল করে "লাহোর" করা করা খুবই সম্ভব। সে ভাবছে এখন সে "নেল্লোর" যাচ্ছে। আমরা শুনে অবাক, কারণ নেল্লোর হোলো মাদ্রাজের পথে আর এ বেচারী নিশ্চিন্ত মনে ঠিক তার উল্টো পথে চলেছে। তার পকেট থেকে ভারত গভর্নমেন্টের প্রদত্ত বিনা পয়সায় গন্তব্যস্থানে পৌছবার পাশখানি দেখালো, তাতেও দেখলাম লেখা রয়েছে নেল্লোর। তাকে আবার বহুকষ্টে বোঝান হোলো এ গাড়ি তার গন্তব্যপথে যাচ্ছে না—সে ভুল পথে এসেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে দেখা গেল সামনে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে তাকে নাবিয়ে যদি কানপুর হয়ে ঝান্সি পাঠানো যায় তবে মাদ্রাজের গ্রাণ্টট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসযোগে সে নেল্লোর শহরে পৌছুতে পারে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি থেকে পথে খাবার জন্যে অনেক কিছু মিস্টি, ফল, পাউরুটী ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেগুলি এই অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে বললেন। খাবারগুলি

পেয়ে সে অত্যন্ত খুশি। একটি কার্ডে মাস্টার মশায় ইংরেজী ভাষায় লিখেদিলেন যে, এই ব্যক্তি কোন ভাষা বোঝে না, ভুলপথে এসে পড়েছে, যাবে নেল্লোর। কানপুর ও ঝান্সীতে একে যেন সাহায্য করা হয়; ও বর্মা ফেরৎ একটি দুর্গত। গাড়িতেই একটি কানপুর যাত্রীকে পেয়ে তার জিম্মায় একে দিয়ে দেওয়া হোলো এবং বলে দেওয়া হোলো—কানপুর পর্যন্ত যেন ওকে দেখেশুনে নিয়ে গিয়ে যেন ঝাঁসির গাড়িতে চড়িয়ে দেয়।

বেরিলী জংশনে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন মধ্যরাত্রি। আমাদের কাঠগুদামের গাড়ি আসবে ভোরে। গ্রীষ্মের রাত্রি স্টেশনে উন্মুক্ত আকাশের তলে কাঁকরের উপরেই হোল্ড-অল্ খুলে শোবার আয়োজন করলাম। সামান্য যা খাদ্য তখনকার মত পেলাম তাই খেয়ে গাড়ির ভীড়ের পরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পেরে সকলেই বিশেষ আরাম বোধ করেছিলাম। কাঠগুদাম থেকে বাসে বেলা প্রায় দশটার পর রওনা হই আলমোড়ার উদ্দেশ্যে। আলমোড়ার পথটি বরাবরই বাঁধানো। রাস্তাটি নৈনিতালের ধার দিয়ে রাণীক্ষেতের বিদেশী সৈন্যদের সুখপ্রদ ছাউনী ঘুরে তারপর আলমোড়ায় পৌঁচেছে। সব সমেত প্রায় ৮০ মাইলের উপরে এই রাস্তাটি। কাঠগুদাম থেকে সরাসরি আর একটি পায়েহাঁটা রাস্তা আছে, সেটি খুব প্রাচীন, এই পথে বহু যুগ থেকে তিব্বত ও ভারতের ব্যবসা ও যাতায়াত চলে আসছে। আলমোড়া পায়ে হেঁটে গেলে ৩০ মাইল লম্বা বহু যাত্রী পায়ে বা ঘোড়ার পিঠে এখনো এ পথে চলাচল করে।

পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা সহজ নয়, তবে এটুকু অনুভব করলাম যে হিমালয়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনায় আসামের পর্বতশ্রেণী বা দক্ষিণ ভারতের বা মধ্যভারতের বড় বড় পর্বতশ্রেণীর অনেক তফাৎ। হিমালয়ের মধ্যে আছে পুরুষোচিত সৌন্দর্য, যা শক্তির বিকাশের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে আর অন্যান্য পর্বতের শোভায় নারীসুলভ মাধুর্য্য প্রচুর। হিমালয়ের গাছপালার বৈচিত্র্য বিশেষ নেই—অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর মত। তাই গরমের দিনে তাকে যেন অনেক শুকনো লাগলো। ক্রমশই ধীরে ধীরে যতই উপরের দিকে উঠতে লাগলাম, ততই কেবল দেখলাম পাইন, টীক

বা দেওদারের গাছ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের মত ডোরাকাটা নানাপ্রকার ফসলের ক্ষেত—পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

মোটর বাস্‌টি ছিল আলমোড়ার ডাকবাহী গাড়ি, সুতরাং এর গতি ছিল অন্যান্য গাড়ির চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। ডাকের ঝুলিগুলি সব নেওয়া হয়ে গেলেই কাঠগুদাম থেকে রওনা হলো। বাসটিতে সবসমেত যাত্রীর সংখ্যা ছিল আমাদের নিয়ে মোট ৮ জন। তাই এ পথে ভীড়ের হাতে কষ্ট পাইনি। কিন্তু কষ্ট পেতে হয়েছিল পথের আঁকাবাঁকা পাকের মধ্যে পড়ে। মোটর বাসে যারা পার্বত্য পথে যাতায়াত করেছেন তারা এ বিষয়ে নানারূপ অভিজ্ঞতার সুযোগ নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমাদের সহযাত্রী আলমোড়াবাসী একটি ডাক্তার ছিলেন সপরিবারে। প্রথম তাঁর স্ত্রী বমি করতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণবাদে আরম্ভ করলেন তাঁর স্বামী, আমাদের মাস্টার মশায়ও এই লম্বা ট্রেন ভ্রমণের পর ক্লান্ত ছিলেন, তিনিও অসুস্থ বোধ করে নৈনিতালের বাঁক পেরিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সমস্ত রাস্তা তিনি আর নিজেকে সতেজ করে তুলতে পারেন নি। এই পার্বত্য পথটিতেই তিনি সবচেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়লেন এবং সেখানে পৌছে দু' তিন দিন লেগেছিল তার জের কাটতে।

আলমোড়ায় আমরা অতিথি হয়েছিলাম, মাস্টার মশায়ের পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত হীরেন ঘোষের বাসায়। বাসাটি সেখানকার প্রধান রাস্তা মল্‌ রোডের উপরেই এবং জায়গাটিও ভালো। সম্মুখের দৃশ্যটিও মন্দ ছিল না। তার স্ত্রী শ্রীমতী মণিকাদেবীও এক সময় কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন। তাদের পূর্বে কোন চিঠি না দেওয়ায় এবং রওনা হবার পূর্বে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তা না পাওয়ায় তারা আমাদের সকলকে হঠাৎ দেখে অবাক। মাস্টার মশায়ের আর একটি পুরাতন ছাত্রীও এই গ্রীষ্মে এখানে বেড়াতে এসে এ বাড়িতে উঠেছিলেন। এই শহরেও কয়েকটি আলমোড়ার ছাত্রী ছিল। সুতরাং এতজন পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাষ্টার মশায় ও আমাদের দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। আলমোড়া শহরটি অন্যান্য সরকারী গ্রীষ্মাবাসের মত বড় নয়। জিলার সদর হিসেবে এ শহরটির সরকারী গুরুত্ব

আছে, তা ছাড়া এখানে একটি ছোটখাট দেশীসৈন্যের ছাউনিও আছে, কিন্তু সৈন্য নেই। শহরটি পাঁচ হাজার ফুটেরও উঁচু একটি পাহাড়ের মাথায় উত্তর থেকে দক্ষিণ লম্বালম্বীভাবে গঠিত। পূব ও পশ্চিম দুই দিকই ঢালু হয়ে নেবে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। মধ্যস্থলের ঘন বসতিটি এদেশীয় বাসিন্দায় পরিপূর্ণ ও অপরিষ্কার। শহরের শেষে দক্ষিণ দিকের নাম Briton Corner, জায়গাটি সুন্দর। এর অল্প নীচেই পাহাড়ের গায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁদের সাধনার জন্য অনেকগুলি ছোটখাট বাড়ি করে বাস করেন। স্থানটিও খুব নির্জন। বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে নীচে ঢালু পাহাড় নেমে গিয়ে একটি নদীতে থেমেছে, তার পরেই আবার পাহাড় উঠতে লাগল। মিশনের খানিক আগে বড় রাস্তার ধারেই জগদীশ বোসের কৃতি শিষ্য ও বৃক্ষতত্ত্ববিদ শ্রীযুত বশী সেনের বাড়ি। তাঁর আমেরিকান পত্নীসহ তিনি সেখানে আছেন। সেই বাড়িতেই তিনি ছোটখাট গবেষণাগার গড়ে তুলে গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করেই চলেছেন। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার একাজে তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। পরীক্ষার সুবিধার জন্য তাঁর বাড়ির আশেপাশে অনেকখানি জমি তিনি সংগ্রহ করেছেন। বিখ্যাত Botanist বীরবল সাহানীও সেই গ্রীষ্মে আলমোড়ায় তাঁর নিজস্ব বাড়িতে সপরিবারে বাস করছিলেন।

সেখানে গিয়ে শুনলাম, এ বছর গ্রীষ্মে আলমোড়া খুব আরামের হবে না, কারণ জলকষ্টে সমস্ত শহরের অধিবাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। যে ঝরনা থেকে শহরে জল সরবরাহ করা হয়, সে ঝরনার জল কমে আসায় আবশ্যক জল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মিউনিসি-প্যালিটি জল ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ঠিক করেছেন বাড়ি পিছু। যুদ্ধের বাজারে কলকাতার শহরে চিনি বা কেরোসিন তেল সংগ্রহের মত সেখানে জল সংগ্রহের জন্য সার বেঁধে লোক টিন, ঘড়া, কলসী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকতো সেই নিয়মকে সুসম্পন্ন করতে। কখনো দেখছি, কোথাও একফোঁটা করে জল কলের মুখে পড়ছে দেখে আগ্রহের সঙ্গে কেউ না কেউ ঘটি-বাটি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে এক বাটি বা

এক ঘটি খাবার জল পাবার আশায়। শহরের ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদেরই জলকষ্ট পোহাতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এতখানি জলকষ্ট এ বছর ভোগ করতে হয়েছে বর্ষা দেরিতে আসায়, যে সচরাচর অন্য বৎসর হয় না। আমাদের গৃহকর্তা একটু বেশী জল সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তবু কোন কোন দিন আমরা বিনা স্নানেই কাটিয়েছি বাধ্য হয়ে। জল যেদিন পেয়েছি, তা দিয়ে কেবল গা, হাত-পা ভেজানো চলতো।

এখানে আসার পর প্রথম কয়দিন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার ছিল বলে আমাদের মন্দ লাগছিল না। প্রতিদিনই সকালে বিকালে সকলে মিলে বেড়াতে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ। আমার ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হোত, কিন্তু মাষ্টারমশায় ও অন্যান্যদের তা হয়নি। শহরের দেশী পাড়ায়, বাজারে দূরে পাহাড়ের গায়ে নানা স্থান দেখে বেড়াতেন। কোন কোন দিন ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যেতো। মাষ্টারমশায়ের বেড়ানো একটু অন্য রকমের। তিনি চলতে চলতে আশেপাশের গাছ, পাতা, ফুল, ফল, পাথর, বাড়ি দেখতে দেখতে এবং ভাল করে তদারক করতে করতে চলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো সব সময়ই ব্রহ্মদেশীয় একটি থলি, তার ভিতরে ছুরি, পেনসিল, ছবি আঁকবার সাদা কার্ড, চাইনিজ ইংকের একটি ছোট কৌটা, সঙ্গে একটি জাপানী তুলি, কিছু ওষুধ, টর্চ, ন্যাকড়া ইত্যাদি টুকিটাকি আরো কিছু। এবং হাতে তার প্রধান সহায় পাঁচ ফুট লম্বা পাকা বাঁশের লাঠিটি। তিনি কখনো ইয়োরোপের আর্টিস্টদের মত ছবি আঁকবো বলে বা সেই মন নিয়ে বেড়াতে যান না, তিনি কেবল দেখতে যান। এই দেখাই হোল তাঁর শিল্পীমনের মূল কথা। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়তো নিরর্থক হবে না।

পূর্বেও মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে নানা উপলক্ষে বহু স্থানে বহুবার ভ্রমণে বেরিয়েছি। প্রতি বৎসরেই পৌষ মাসে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ও অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে তাঁবু ও রান্না-খাওয়ার সরঞ্জামসহ দশবার দিনের মত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই প্রকার ভ্রমণের ভিতর দিয়ে কতগুলি ভাল ফল দেখা গেছে। প্রথমত, এর দ্বারা শান্তিনিকেতনের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনে; দ্বিতীয়ত, কর্মজীবনের

দূষিত হাওয়া মাঝে মাঝে যদি কখনো পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাও পরিষ্কার হয়ে যায়। তার চেয়ে বড় কথা হোলো আমাদের আশেপাশের জগতকে ভালো করে শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখতে শেখানো। যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজে সব কিছু দেখে বেড়ান। এই রকম বেড়ানোর জন্যেই তিনি শহরে এমনকি শহরের নিকটবর্তী স্থানেও তাঁবু ফেলতে নারাজ। কিন্তু পল্লীগ্রামের কাছে বাস করায় তিনি কখনই আপত্তি করেন না, ভালোই বাসেন। সেখানে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক, সকলে মিলে অনাড়ম্বর পল্লীপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে যান। মাষ্টারমশায়কে বলা চলে সত্যিকার People's Artist। ভারতবর্ষের ৯০ ভাগ প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। তাই এ যুগের শিল্পীর মধ্যে যদি তার কোন ছাপই না পড়ে, তবে বলতে হবে তার মন সতেজ নয়, নির্জীব। এই শান্তিনিকেতনের জীবনে মাষ্টারমশায়কে দেখেছি, গ্রাম্য-জীবনের সবকিছুর সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা দিনে দিনেই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত ছোট অসংখ্য কার্ডে পেনসিলে বা তুলির ছবিতে দেখা যাবে গ্রাম্যজীবনের প্রকাশ, কতভাবে কতরূপের মধ্যদিয়ে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের অতি সহজে আপনার করে নিতে পারার মত গুণ তাঁর মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পীমহলে তা খুব কম দেখা যায়। শিল্পীদের লোকে দোষ দেয়, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না বলে, শহুরেদের সঙ্গে চট করে না মিশতে পারায় মাষ্টারমশায়কেও সে দোষে দোষী করা যায়। কারণ শহুরে জীবনের কৃত্রিমতাকে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি যখন গ্রামে যান, শিল্পী হিসেবে নয়, তাদের জীবনকে আঁকতে নয়, তাদের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তাই সেখানে বড় বড় কাগজ, পেনসিল ও রঙের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনে তাক লাগাবার কোন চেষ্টা তাঁকে কখনো করতে দেখিনি। তিনি ছোট ছোট কার্ডে, চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গিয়ে হয়তো ফস করে একটা আঁচড় দিয়ে নিলেন। যে জানে, সে বুঝবে, তাঁর মনের উপরে কি আঁকা হয়ে গেল। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলেন, স্কেচ করবার সময় বস্তু বা প্রাণীর মূল ছন্দটিকে বুঝতে পারা এবং তাকেই

কাগজে আগে ধরে নেওয়াই হোলো স্কেচ করার প্রকৃত অর্থ। গতিশীল যা কিছু তার ভিতর থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে গতির মূল ভঙ্গিটিকে প্রথমে ধরতে পারলে স্কেচের সময় আর কিছু আঁকার প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার দ্রুত ধরবার ক্ষমতাতেই ধরা পড়ে শিল্পীর মন কতখানি সেই বস্তুর ভিতরে ঢুকতে পেরেছে। মূল ছন্দটি ধরা হয়ে গেলে পরে ধীরে সুস্থে বাকিটুকু বাড়ি বসে তৈরী করে নিলে কোন ক্ষতি নেই। এইভাবে শিল্পাচার্যের শিক্ষাদানের কাজ চলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। তাদের সঙ্গে তিনি আছেন ও নিজে আঁকছেন। সেই সঙ্গে তারা তাঁকে দেখছে ও নিজেরাও আঁকছে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাটি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এইভাবে খুলে ধরেন, তাঁর কর্মের ভিতর দিয়ে, মুখে বক্তৃতা দেওয়ার তিনি মোটেই পক্ষপাতী নন। প্রশ্ন এলে তার জবাব দেন মাত্র, তার বেশী নয়। মোট কথা তাঁর সমগ্র শিল্প-জীবনটিই হোলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি সুন্দর বক্তৃতা। তাঁর শিল্প দৃষ্টি কতখানি পরিষ্কার, তার একটি উদাহরণ দিই,—তিনি জীবনে কখনো নৃত্যের চর্চা করেছেন বলে শুনিনি, কিন্তু তিনি বহু প্রকার নাচ দেখেছেন। তাঁর হাতে আঁকা যাবতীয় নৃত্যের ছবির বা স্কেচগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে আপনা থেকেই মনে প্রশ্নের উদয় হবে যে, তিনি একজন নিপুণ নর্তকের অভিজ্ঞতাতে আঁকার মত এত নাচের ভঙ্গি পেলেন কোথা থেকে? অথচ একথা জোর করে বলতে পারি যে, কোনদিন তিনি কোন নাচিয়েকে ভঙ্গি করে দাঁড়াতে বলেন নি। গ্রামে যখন ঘুরে বেড়ান, তখন সেখানকার যাবতীয় কুটীরশিল্পকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবেন ও তাদের কর্মপদ্ধতিকে বোঝবার চেষ্টা করবেন। ছেলেদের সেইদিকে উৎসাহিত করবার জন্যে কুটিরশিল্পের আয়োজন করেছেন, গ্রাম্য শিল্পীদের সেখানে আনিয়ে।

আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কাছে প্রায়ই যেতাম, একদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ তাঁদের মন্দিরে গুরুদেবের বহু ধর্মসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলাম। মসোজী গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজালেন।

মাষ্টারমশায়ের যোগ এই মিশনের সঙ্গে অনেকদিন থেকে। তিনি নিজে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একজন বিশেষ ভক্ত। ভগিনী

নিবেদিতার আমলে এই মিশনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্টতা ছিল এবং নিবেদিতাও ছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনঃ প্রচারের একজন প্রধান উৎসাহী। তখনকার অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে অজন্তার চিত্রাবলী চর্চার সুবিধার জন্যে নিবেদিতা বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১১ সালে যখন মাষ্টারমশায়দের অজন্তাচিত্রাবলী আঁক্‌বার জন্যে প্রস্তাব করা হয় তখন সেই দূর অজানা অচেনা প্রদেশে যেতে হবে শুনে তাঁরা খুব উৎসাহ বোধ করেন নি। কারণ সে সময় যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার আজকালকার মত সুব্যবস্থা ছিল না। নিবেদিতা একরকম জোর করেই তাঁদের পাঠিয়েছিলেন। এবং তাঁদের কাজের সময় জগদীশবসু সহ একবার তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখেও এসেছিলেন। ফিরে আসবার সময় শিল্পীদের দেখাশোনা করবার জন্য তাঁর সেক্রেটারী গনেন মহারাজকে সেখানে রেখে এলেন। সেই থেকে গনেনমহারাজের সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের পরিচয়।

আলমোড়ার শ্রীযুত বশী সেন মাষ্টারমশায়ের বিশেষ বন্ধু। তাঁদের উভয়ের বন্ধু সুলভ সহজ আলাপ আলোচনা, আমাদের মনে খুব কৌতুক উদ্রেক করত। তাঁর বাড়িতে তিনি প্রায় আমাদের নিয়ে গেছেন, গাছপালা নিয়ে তাঁর পরীক্ষার নমুনা দেখাতে। কোন্ ধান বা গম বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাভাবিক ফলনের মাস দুই পূর্বেই ক্ষেত থেকে কেটে আনা যায়, কি করলে সাধারণ চাষের চেয়ে বহু পরিমাণে বেশী উৎপন্ন হয়, বিদেশী দূর্বাঘাস আমাদের দেশে চেষ্টা করলে গরুর খাদ্যের পক্ষে খুবই উপকারী হতে পারে, এ রকম বহু পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন। ফল ফুলের গাছ নিয়েও নানা-রূপ পরীক্ষা তিনি করছেন। তাঁর বিদুষী মার্কিন স্ত্রীও তাঁকে এসব বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁর চীন ও জাপানী ছবির অনেক সংগ্রহ আছে। সে দেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত থাকা কালে এই সব ছবি তিনি জোগাড় করেছিলেন। মাষ্টারমশায়কে একদিন সব দেখালেন। সংগ্রহের সবই যে ভাল, তা বলা চলে না, তবে কিছু ভাল সংগ্রহ চোখে পড়ল। বাড়িতে স্থানাভাব বশত সবই প্রায় বাক্সেতে বন্ধ থাকে। শ্রীযুক্ত বশী সেন নিজে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের ভক্ত, তাঁর বাড়িতে একটি পূজাগৃহে এই দুই মহা-

পুরুষের মূর্তি ও ছবি সযত্নে চৌকীতে সাজানো। মূর্তিপূজার প্রায় সব উপকরণ দেখলাম চৌকীটার চারিদিকে।

দশবারো দিন আলমোড়া বাসের পর, মায়াবতী আশ্রমের জন্য তৈরী হলাম। আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা মায়াবতীতে পূর্বেই খবর পাঠিয়েছিলেন। আলমোড়া বাসের এই ক'দিনের মধ্যে হিমালয়ের বরফশৃঙ্গ দেখবার সুবিধা একদিনও আমাদের হয়নি। প্রথম কয়দিন যদিও আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল—কিন্তু শেষদিকে কুয়াসার মত একটা ধূলোর আবরণ চারিদিকে ছেয়ে গেল। কখনো কখনো তার গাঢ়তা এত বেশী হয়ে উঠতো যে, আধ মাইল দূরের গাছপালা, মানুষও ঢাকা পড়ে যেত। আলমোড়ার এই অবস্থা দেখে মন বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শুনলাম, এই ধূলোর আবরণ মধ্য প্রদেশের সমতল দেশ থেকে উঠে এখানে আটকে আছে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত যাবে না এবং এর দ্বারা অবিলম্বে বৃষ্টির সূচনা করছে।

আলমোড়া শহর থেকে, হাঁটা পথে মায়াবতী পঞ্চাশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটেই সকলে যাতায়াত করে। প্রতি আট দশ মাইল অন্তর সরকারী ডাকবাংলা কিম্বা দেশী সরাই-খানা আছে। এই সব সরাইখানার পরিচয় হিমালয় যাত্রী মাত্রই জানেন। মাষ্টারমশায়ের জন্যে একটি ঘোড়া ও দুটি মালবাহী ঘোড়া ঠিক করে আমরা ১৫ই জুন দুপুর বেলা আলমোড়া ত্যাগ করি। আগের দিন রাত থেকে সমস্ত সকাল খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় অনেকটা ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল। আলমোড়া ত্যাগ করেই ২॥ মাইল রাস্তা সোজা নীচে নামতে হয়েছিল একটি নদী পর্যন্ত। সেটি পার হয়ে রাস্তাটি ৬ মাইল পর্যন্ত একটানা উপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের এই চড়াই ও উৎরাই ব্যাপারটাই সমতলবাসীদের পক্ষে প্রাণান্তকর হয়ে উঠে। এ ধরনের এতখানি ওঠানামা যেখানে নেই, এ দেশবাসীরা তাকে ময়দান বলতে কিছুমাত্র সংকোচ করে না। এই পথে প্রথম আমরা হিমালয়ের অতি উচ্চ বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখতে পেলাম। উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে

আছে। মেঘের রাজ্য ভেদ করে যখন চকচকে রূপালী মাথা ভেসে ওঠে, তখন মনে হয় না ঐ পাহাড়গুলি এ জগতের, মনে হয় যেন আকাশেই আর এক জগতে তাদের বাসা। প্রথম রাত্রি "জালনা" নামে একটি সরাইখানায় কাটালাম। পরের দিন দুপুরে "সুরফটক" নামে অপর এক সরাইয়ে খিচুড়ী খেয়ে রাত দশটায় "দেবীধূড়া" নামে একটি প্রায় সাত হাজার ফুট পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম; এ চূড়াটি শক্তি উপাসকদের একটি পীঠস্থান হিসেবে বিখ্যাত। বড় বড় পাথরের আড়ালে দেবীর ছোট মন্দির ও তান্ত্রিক সাধনার চক্রস্থানটিও দেখলাম। বাইরেও কাঠের কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড দুই পাইন গাছ পুতে দড়ির বদলে লোহার শিকলে তৈরী দুটি বড় বড় দোলনা দেখলাম। শুনলাম কোন উৎসব বা বিবাহ উপলক্ষে মেয়েরা এখানে দোলনায় দোলে। "জালনা" থেকে "দেবীধূড়া"র দূরত্ব প্রায় ১৭ মাইলের উপর। দেবীধূড়ার মাথায় পৌছতে চার মাইল রাস্তা আমাদের খাড়া উঠতে হলো। পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেই রাত্রের অন্ধকারে দেবীধূড়া চূড়ার অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। এক এক জায়গায় অন্ধকার এত ঘন হয়ে উঠেছিল যে, ৪।৫ হাত দূরের গাছ ও রাস্তা কিছুই দেখতে পাইনি। রাস্তার পাশেই পাহাড়ের গা অনেকখানি নীচ পর্যন্ত খাড়া নেবে গেছে। ঘোড়া ও ঘোড়ার মালিকেরা অতি সন্তর্পণে আমাদের ঠিকভাবেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। যখন উপরে উঠলাম, তখন শরীরের ক্লান্তিতে মনে হয়েছিল যেন পরের দিন সকালে পুনরায় রওনা হওয়া অসম্ভব হবে। রাত ১২টার সময় খাওয়া দাওয়া করে ঘুমের পরে সকালে উঠে অনেকটা নিজেকে তাজা বোধ করেছিলাম। "দেবীধূড়া"র এই মন্দিরের কাছে অতি ছোট একটি বাজার ডাকবাংলা ও একটি ছোট হাসপাতাল ছিল। এই চূড়ার উত্তর দিকের পাহাড়টি হঠাৎ প্রায় খাড়া বহুদূর পর্যন্ত নেমে গিয়ে আবার ধাপে ধাপে উপরে মাথা তুলে উঠেছে। এইখানের নীচু পাহাড়ের সারি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এখানকার ডাকবাংলা থেকে বহুদূর বিস্তীর্ণ পাহাড়ের দৃশ্যটি খুবই মন আকর্ষণ করেছিল। যদিও হিমালয়ের বরফচূড়া পরিষ্কার দেখতে পাইনি মেঘের উৎপাতে, তবুও এ দৃশ্যটি দেখবার মত। "দেবীধূড়া"

পর্যন্ত আসবার পথে মাষ্টারমশায়ের দুটি অত্যন্ত প্রিয় জিনিস খোয়া গিয়েছিল। প্রথম হারালো তাঁর ছবি আঁকার তুলি, কার্ড ইত্যাদি যাবতীয় অন্যান্য জিনিসসহ বর্মাদেশীয় থলিটি। ছবি আঁকার তুলি ও কৌটাটি তাঁর বহু দিনের সামগ্রী। প্রায় ২৫ বৎসর একটানা এইটি দিয়ে তিনি নানা প্রকার ছবি এঁকে এসেছেন। এ দুটি হারিয়ে তাঁর মন বিশেষ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের রাস্তায় ঘোড়ার চলার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব হোল এই যে খাদের দিক না ঘেঁসে সে চলতে চায় না। তার এই অদ্ভুত স্বভাবে পিঠের নতুন যাত্রীদের মনে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আলমোড়া ছেড়ে প্রথম দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মাষ্টারমশায়কে নিয়ে চলতে চলতে ঘোড়ার পিছনের পা হঠাৎ এক খাদের পাশে পিছলে যায়। কিন্তু ঘোড়াটা বাঁচবার কায়দাকানুন বেশ জানে, তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপরেই বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বড় পাথরের টুকরো পাশ থেকে খসে গিয়ে নীচের দিকে হুড় মুড় শব্দে গড়াতে শুরু করলো। ঘোড়ার মালিকরা কিন্তু এ ঘটনায় একটুও বিচলিত হয়নি। সকালে প্রায় বেলা আটটার পর "দেবীধুড়া" থেকে রওনা হয়ে পড়লাম। দুপুর বেলা "ধূণাঘাট" সরাইয়ের রাস্তায় বিশ্রাম ও খাওয়া সেরে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমরা "ক্ষেতিখান" নামে একটি ছোট বাজারে উপস্থিত হলাম। বাজারের ঠিক মাথায় পাহাড়ের উপরে একটি সমতল জমির উপর একটি স্কুলের দুইটি বড় বড় বাড়ি। প্রথমটি হোল স্কুল ঘর দ্বিতীয়টি ছাত্রাবাস। হেডমাষ্টারকে বলে আমরা এই ছাত্রাবাসটিতে সে রাতের মত থাকবার অনুমতি পেলাম। ছুটিতে স্কুলটি বন্ধ ছিল। ছাত্ররা সব বাড়ি গেছে— কেবল হেডমাষ্টারের বাড়ি অনেক দূর বলে এই অল্প দিনের ছুটিতে পয়সা খরচ করে বাড়ি যান নি। তাঁর এক সহোদর ভাইকে নিয়ে নিকটেই একটি বাড়িতে থাকেন। তাঁদের পরিচয়ে জানলাম তাঁরা কাশীপ্রবাসী বাঙালী। কিন্তু তাঁদের চালচলন কথাবার্তায় একেবারেই তা বোঝবার উপায় নেই। বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন না, কিন্তু বাংলায় কথা বললে মোটামুটি বুঝতে পারেন।

আমাদের থাকবার বাড়িটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল ছারপোকা। সমস্ত দিনের শারীরিক ক্লান্তির পর খেয়ে দেয়ে

আমরা নিশ্চিন্তে দোতালার ভিতর দিকের বারান্দার কাঠের মেঝের উপর শুয়েছি। আমি বিশেষ কিছু অনুভব করিনি, কিন্তু মাষ্টারমশায় ও মাসোজীর কথায় সকালে ঘুম থেকে উঠে চেয়ে দেখি সমস্ত বিছানায় ছোট বড় নানাপ্রকার ছারপোকা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—তাঁরা উভয়েই রাত্রে ছারপোকার জ্বালায় আরাম করে ঘুমোতে পারেন নি। নিজের বিছানা তুলে দেখি, কাঠের পাটাতনের ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকার রাজ্য। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের চোখে পড়েনি। শরীরে পথ চলার ক্লান্তিকে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে। তারই জন্যে ছারপোকার সারারাত আক্রমণের মধ্যেও কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোতে পেরেছি। আলমোড়া থেকে এই যে তিন দিনের পথ আমরা এলাম, সেই পথের সরাইয়ের খাবারের বিষয় একটু বলা দরকার।

"ক্ষেতিখান" পর্যন্ত আমরা চারটি সরাইয়ের সাহায্যে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছি। কোন ডাকবাংলায় যায়নি। এই সরাই-গুলিতে চা, দুধ ও কেবল খিচুড়ী রান্না করে খাবার মত চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু ঘি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। পাহাড়ী আটা পাওয়া যায় হাত রুটি করে খাবার জন্যে। এই আটার রুটির স্বাদ ভাল, কিন্তু আমাদের কাছে বড় শক্ত লাগতো এবং বেশী খেতে পারতাম না। সরাইতে দু-এক রকমের পাহাড়ী সন্দেশ বা মিষ্টি পাওয়া যায়। সরাইওয়ালার কাছে খাবার কিনলে সে থাকবার জায়গা দেবে, রান্নার বাসনপত্র, এমন কি দরকার হলে চা, রুটি বা খিচুড়ী রান্না করে খাওয়াবে। কয়েক জায়গায় মাসোজী নিজেই রান্না করেছেন, কখনো আমাদের ঘোড়ার মালিকেরা রেঁধেছে বা কখনো সরাইয়ের মালিকই সব করে খাইয়েছে। প্রতিদিন পাহাড়ে এই চড়াই ও উৎরাই করে, ক্লান্ত দেহে খিদের মুখে আমরা সরাইয়ের চা, দুধ, খিচুড়ী বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম। খিচুড়ীর সঙ্গে থাকতো কেবল বড় বড় পাহাড়ী কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো। আমাদের সঙ্গে কিছু জ্যাম, পাউরুটি, বিস্কুট ও ওভালটিন ছিল, এগুলোও সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্য করেছে। পাহাড়ী পথের সরাইখানাগুলি দেশী যাত্রীর পক্ষে যে অত্যন্ত দরকারী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এইসব সরাইয়ে

পানীয় জল, খাবার, বাসনপত্র, ঘোড়ার বাসের উপযোগী আস্তাবল, খাবার ঘাস, খড় সবই মজুদ থাকে। খরচও খুব কম। তাই যাত্রীরা পথে রাত্রিবাসের ও খাবার জন্যে ভাবনা না করে নিশ্চিন্ত মনে দূর দূর পাহাড়ে পথ অতিক্রম করে। পরিষ্কার অপরিষ্কারের বাছবিচার যাদের আছে, তাদের পক্ষে এই পার্বত্য পথ চলার সময় সে সব ত্যাগ না করতে পারলে সরাইয়ে থাকা অসম্ভব। একটি সরাইয়ে একই চালার নীচে ঘোড়ার পাশেই শোবার জায়গা আমরা করেছি। পাথরের ছোট থামের উপর দাঁড় করানো ছোট একটি ঘরের বারান্দায় আমরা শুয়েছি, তার ঠিক নীচেই ছিল কয়েকটি গরু বাছুর ও মোষ। এইসব জন্তুর ময়লা ও প্রস্রাবের গন্ধের মধ্যেও রাত কাটিয়েছি। পাহাড়ের ঠাণ্ডা দেশে মাছির উতপাৎ দেখে বেশ একটু অবাক হয়েছিলাম, এক একটি সরাইখানা যেন মাছির ডিপো। দিনের বেলা একটুক্ষণও নিশ্চিন্তে বসা যায় না।

আলমোড়া থেকে এ পর্যন্ত পাহাড়ের যা চেহারা দেখেছি তাতে বৈচিত্র্য খুব পাইনি। পাহাড়ের বেশীর ভাগই কেবল পাইন গাছের বন। ঋজু বলিষ্ঠ গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় যেন প্রত্যেক গাছটিই চেষ্টা করছে কত উঁচুতে উঠে কে আগে আকাশ ছুঁতে পারে। পাইনের বনতল সাধারণত পরিষ্কার থাকে। কেবল শুক্‌নো সরু সরু কাঠির মত পাইনেরপাতা তার উপরে গালিচার মত ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। বহু জায়গায় দেখলাম এই শুক্‌নো পাতায় আগুন লেগে মাইলের পর মাইল কালো হয়ে আছে। বড় বড় ভাঙ্গা পাইন গাছে আগুন জ্বলছে। যেখানে পাইন কম সেখানে অন্যান্য গাছ চোখে পড়েছে। পথে চল্‌তে চল্‌তে, পাহাড়ের ছোট ছোট নির্জন গ্রাম থেকে, বা পাহাড়ের ক্ষেত থেকে পাহাড়ীদের সুউচ্চকণ্ঠে পাহাড়ী গ্রাম্যগীতি প্রায়ই কানে আসতো। অন্যান্য পল্লীগীতির মতই এর সুর টানা ও করুণ, কিন্তু কেবল চারিটি স্বরের উপর দিয়ে উঠানামার একটি বিশেষত্ব এতে আছে। নির্জন পার্বত্য পথে এই পাহাড়ী সুরটি খুবই মন আকর্ষণ করেছিলো। পূর্ববঙ্গের বৃহৎ নদীতে নৌকার মাঝিদের টানা সুরের গানে যে রকম উদাসকরা ভাব প্রকাশ পায়, এদের এই

সুরেও সেইটি অনুভব করতাম।

সকালে ক্ষেতিখান থেকে একটি সোজা পথ ধরে আমরা মায়াবতী আশ্রমে যখন উপস্থিত হলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। মায়াবতী যে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত সে পাহাড়ে পাইন গাছ নেই বললেই চলে। "ওক" নামে একরকম গাছ সেখানে প্রচুর। আশ্রমে পৌছুবার আগে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢালু পথে অনেকখানি নামতে হয়েছিল একটি পাহাড়ে নদী পর্যন্ত, সেটি পার হয়ে আবার অনেকখানি উপরে ওঠার পর মায়াবতী আশ্রম চোখে পড়ল। মাষ্টারমহাশয় সহ আমাদের আগমন সংবাদ আগেই পৌছেছিল, তাই সন্ন্যাসীরা সকাল থেকেই প্রতীক্ষা করেছিলেন। বর্তমান যুগের আশ্রম হিসেবে মায়াবতী হোলো আদর্শ। কোন রকমের দ্রুতগামী যানবাহনের সুবিধা নেই, সুতরাং কেবল বেড়াবার ঔৎসুক্য নিয়ে মায়াবতী দেখতে কেউ আসে না। তাই সাধুরা অযাচিত দর্শকের ভীড় থেকে শান্তিতে আছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই নির্জন পাহাড়ের কোলে ৭।৮টি সাধু তাঁদের সাধনায় দিনযাপন করছেন। আশ্রমের উত্তর দিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বহুদূর পর্যন্ত ছোট বড় নানা প্রকার পাহাড়ের মাথাগুলি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা যেত।

এই আশ্রমটির স্থাপিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ডবাসী শিষ্য মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর পত্নী দ্বারা। স্বামীজী যখন বিলেতে তখন তাঁর ধর্মোপদেশ শুনে এঁরা দুজনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে নির্জন সাধনায় দিন কাটাবেন, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। পূর্বে এই স্থানটি অপর একটি সাহেবের চা বাগান ছিল। বোধহয় যাতায়াত কিম্বা এখানকার মাটি ও আবহাওয়া চা গাছের উপযোগী নয় দেখে তিনি যখন বিক্রয় করবেন মনস্থ করেন তখন বাড়ি সমেত সমস্ত বাগানটি মিঃ সেভিয়ার ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ক্রয় করেন। পরে নিজেদের সুবিধা মত বসবাসের নানা ব্যবস্থা করেছিলেন। এখনো আশ্রমের আশে পাশে প্রাচীন চা গাছের সারি দেখা যায়। সাধুদের বর্তমান বাসস্থানটি পূর্বে ছিল চায়ের গুদাম ও কারখানা। আশ্রমের গোশালার নিকট অপর বাড়িটিতে চা বাগানের সাহেবরা থাকতেন। স্বামীজীর নাকি ইচ্ছা ছিল এই স্থানেই তাঁর

বিশ্রাম ও সাধনার জীবনযাপন করবেন। কিন্তু মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি সেভিয়ার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে যেবার প্রথম আশ্রমে আসেন তার পর আর আসতে পারেননি। এখানে ১৫ দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে, সেই বৎসরই মারা যান। শোনা যায় সেভিয়ার পত্নীও নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ইনি পাহাড়ীদের কাছে মার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও সেবার দ্বারা। তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখে একটি পাহাড়ী যুবক পরে আলমোড়া জেলার একজন সম্মানী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। এই আশ্রমটির বর্তমান চেহারার পিছনে এই সাহেব দম্পতীর অক্লান্ত পরিশ্রম সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখানে ইংরেজী "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিস। বাড়িটি দোতলা। পূর্বে এখানে যে ছাপাখানা ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা অসুবিধায়। শোনা যায় এই কাগজটির জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে সেভিয়ার বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। এখন এই কাগজটির বয়স ৪৭ বৎসর। এই আশ্রমের নিজের ফুল ও ফলের বাগান ও ২০।২৫টি গরু সমেত একটি গোশালা দেখলাম। এর সব দেখা শোনা তদারক করেন একজন সন্যাসী, তাঁর হাতেই আশ্রমের অন্যান্য সন্যাসীদের খাওয়া দাওয়া সুখ-সুবিধার তদারকের ভার। দ্বিতলে একটি অতিথিশালা আছে। তার উপরে দুটি ও নীচে দুটি ঘর। অতিথির সুখ-সুবিধার সব ব্যবস্থাই এতে আছে। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা এখানেই হয়েছিল। একটি আরোগ্যশালা তৈরী হয়েছে এ অঞ্চলের দরিদ্রদের রোগ নিবারণের জন্যে। বাড়ি নির্মানের টাকা দিয়েছিলেন ভারতের একজন সামন্ত নৃপতি, অন্যান্য দানও তাঁরা পেয়েছেন। এই হাসপাতালটি আলমোড়া জেলায় খুবই সুনাম অর্জন করেছে। বহুদূর থেকে সন্যাসীদের সেবার উপর বিশ্বাস রেখে রোগীরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসে। পূর্বে সন্যাসীরা নিজেরাই ডাক্তারের কাজ করতেন, এখন কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায়, কলকাতার মেডিকেল কলেজের একজন পাশ করা যুবক ডাক্তারকে সেখানে তাঁরা নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের কাজের সহায়তার জন্যে। হাসপাতালটির নীচের তলায় রোগীদের থাকবার জন্য ১২টি বেড করা হয়েছিল। কিন্তু রোগীর চাহিদা বেশী হওয়ায় এই সঙ্কীর্ণ স্থানেই কোনমতে ২২টি বিছানার ব্যবস্থা

করেছেন। দোতালার একটি ঘরে অপারেশনের সম্ভবপর সব ব্যবস্থাই রয়েছে,অপর একটি ঘরে দেখলাম ছোটখাটো একটি ল্যাবরেটারী। দরকার মত রক্ত পরীক্ষার দ্বারা রোগ নিরূপণের সুবিধা সেখানে আছে। সে অঞ্চলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসার জন্যে এক বছরের মত ওষুধ ইত্যাদি তাঁদের হাসপাতালে মজুদ থাকে। গত বৎসর তাঁদের এই হাসপাতালে সব সমেত ১৩ হাজারের মত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল। সন্ন্যাসীরা সেবার দ্বারা এ অঞ্চলের রোগীদের কাছ থেকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তা দেখবার মত। পাহাড়ীরা নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ না করে এখানেই চলে আসে। সরকারী হাসপাতালগুলি সেখানে নামেই হাসপাতাল। রোগীর রোগ সেখানে নিরাময় হয় না বটে, তবে রোগীকে চিরদিনের মত রোগ শোকের বাইরে পাঠাতে তারা বিশেষ পটু। আমরা থাকতে থাকতেই একদিন দুপুরে একটি পাহাড়ী যুবতীকে নিয়ে এলো মরণাপন্ন অবস্থায়। শোনা গেল আগের দিন বেলা তিনটায় একদল গ্রামের মেয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে ঘাস কাটতে। অসাবধানতাবশত একটি মেয়ে কিছু দূরে একলা চলে যায়। সেই সুযোগে একটি ভল্লুক তাকে আক্রমণ করে। নানা অসুবিধায় সেই দিনই মেয়েটিকে হাসপাতালে আনা যায়নি। পরের দিন যখন আনা হোলো, তখন দেখা গেল মাথার খুলির উপরের চামড়াটি নাক থেকে শুরু করে আঁচড়ে তুলে দিয়েছে—চোখ দুটি কোন রকমে বেঁচে গেছে। ঘাড় ও পিঠের বহু স্থানের মাংস ক্ষতবিক্ষত। এতক্ষণ ধরে রক্তপাত হওয়ায় গায়ে একটা বীভৎস গন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাঁচবার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করিনি। কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম, সে মেয়েটি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেছে। যদিও হাসপাতালটি অতিথিশালার অনেক দূরে ছিল তবুও মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর চীৎকার প্রথম কয়দিন আমাদের কানে প্রায়ই এসে পৌছুতো।

শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর এখানেই প্রথম আমরা সর্বাঙ্গে প্রচুর জল ঢেলে স্নান করে আরাম পেলাম। আলমোড়ায় জলাভাবে সে সুযোগ হয়নি। মায়াবতীর পথে প্রথমদিন বৃষ্টি পেয়েছিলাম পরে

আর পাইনি। প্রথম দু'দিন আশ্রমে বেশ কাটলো, কিন্তু তার পরেই শুরু হোলো পাহাড়ের দেশের বৃষ্টি। আমাদের বাড়ির নিকটের পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে অনবরত কালো সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে উড়ে চলেছে, আর কখনো পাতলা ইলসেগুঁড়ির মত বা বড় বড় ফোঁটা ফেলে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের এত কাছে বসে মেঘ ও বৃষ্টির খেলা দেখতে বেশ লাগছিল। মাঝে মাঝে সামনের পাহাড়টাকে ঢেকে ফেলত এবং প্রায়ই পাতলা মেঘের ফাঁকে পাহাড়ের গায়ে গাছের দিকে তাকালে অনেক রকম জন্তু বা মানুষের আকার ভেসে উঠতো। অর্থাৎ গাছগুলির পিছনে ও সামনে মেঘ জমা হয়ে মাঝে মাঝে তার চেহারার বদল করে দিত। আশ্রমের জলের ব্যবস্থাটিও সুন্দর। উপরের একটি ঝরণা থেকে পাইপের সাহায্যে জল আনিয়ে সমস্ত আশ্রমটিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই জলের জন্য সন্যাসীদের কিছু ভাবতে হয় না। আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত বহু পুস্তক দেখলাম। বাছাবাছা বই তাতে আছে। এই নির্জন পাহাড়ে এই বইগুলি সন্ন্যাসীদের জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্গী একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। প্রতিদিন খবরের কাগজ, চিঠি পত্রাদি পাওয়া যায়। এই নির্জনে বাস করেও তাঁরা যে বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্যুত নন এ সব ব্যবস্থার দ্বারা তা বোঝা যায়। পাহাড়ী চাকরের সাহায্যে এখানকার রান্না তৈরী হয় এবং তার ব্যবস্থাও ভালো; সন্ন্যাসীরা তাদের নানাপ্রদেশের বিশেষ বিশেষ রান্না শিখিয়ে নিয়েছেন। তাই আমরা যে কয়দিন ছিলাম প্রতিদিনই নতুন নতুন কিছু না কিছু মুখরোচক খাবার পেয়েছি। প্রতি সন্ধ্যায়ই সন্ন্যাসীদের কাছে গুরুদেবের গীতাঞ্জলি বা নৈবেদ্য থেকে গান গেয়ে শোনাতাম ঘণ্টাখানেকের মত। ছোট একটি ভলিবল খেলবার মাঠে সাধুরা রোজ খেলতেন। আমি ও মাসোজী যে কয়দিন ছিলাম তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছি। একদিন সাধুরা মাষ্টারমশায়কে শিল্পবিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তিনি সে আলোচনায় সম্মত হয়ে সন্যাসীদের বলেছিলেন তাঁদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। সন্যাসীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন,—"আর্টের মূলকথা কি ও আর্টের সঙ্গে

আধ্যাত্ম সাধনার যোগ আছে কিনা?" পরে এ আলোচনাটি সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ লিখে এনে মাষ্টারমশায়কে দেখিয়ে নিয়েছিলেন। "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় প্রকাশ করবার অনুমতিও নিয়েছিলেন।

এই আলোচনা সন্ন্যাসীদের উপযোগী হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ এ মিশনের সাধুরা যদিও কিছু সংগীত চর্চা করেন তবুও চিত্রকলার প্রতি তাঁরা চিরদিনই উদাসীন; তারা ছবি দেখেন, ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, কিন্তু কেউ আঁকেন বলে কখনো শুনিনি বা তার পরিচয় পাইনি। অথচ সন্যাসীরা সকলেই জানেন তাঁদের এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও তাঁর গুরু পরমহংসদেব কিভাবে আর্টকে দেখে গেছেন এবং কি উপদেশ তাঁদের জন্যে রেখে গেছেন। সেখানেই বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী থেকে আর্টের উপর একটি বক্তৃতা আমাদের তাঁরা দেখালেন, পড়ে দেখি তার শেষ কটি লাইনে স্বামীজী বলেছেন,—

The artistic faculty was highly developed in our Lord, Sri Ramkrisna, and he used to say that without this faculty none can be truly spiritual."

এই মূল্যবান উপদেশটি হয়তো এখনো কার্যকরীভাবে সন্যাসীদের কাছে প্রকাশ পায়নি, আশা করি ভবিষ্যতে নিশ্চয় এর প্রকাশ দেখা যাবে।

এখানে সন্যাসীদের যত্নে আমরা যে খুব আনন্দেই ছিলাম সেকথা বলাই বাহুল্য। আলমোড়া ও মায়াবতী আশ্রমে সন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশার পর তাঁদের শিশুসুলভ সরল মনোভাবটির পরিচয় পেয়ে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল। বয়স্কদের মধ্যে ছোট বড় মনোভাব নেই বললেই হয় এবং নিজেদের জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের অভিমানও যে আছে, অন্তত বাইরের পরিচয়ে আমি ধরতে পারিনি। সকলেই বর্তমানকালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভারতীয় জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের অধিকারও এঁরা পেয়েছেন।

আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল তাই তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার জন্যে সেই পাহাড়ে-বৃষ্টি মাথায় করেই শেষকালে বেরিয়ে পড়তে হোলো। আশ্রম থেকে সন্যাসীরা বর্ষাতি, বিছানাপত্র ঢাকা দেবার জন্যে Oil cloth ইত্যাদি দিলেন। ফেরবার সময়

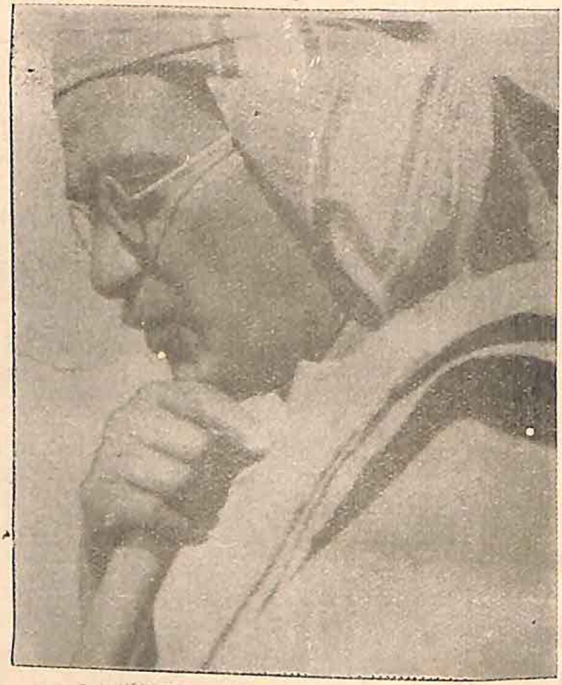
ঘোড়াওয়ালারা সেগুলি নিয়ে আসবে। এখান থেকে হেঁটে গিয়ে আমাদের "তনকপুর" স্টেশনে গাড়ি ধরবার কথা। এই রাস্তাটি ৪৫ মাইলের মত লম্বা। আমাদের নতুন তিনটি ঘোড়া ও তার মালিকরা আশ্রমের বহুদিনের পরিচিত। তারা সর্বদাই সাধুজীদের মায়াবতী ও তনকপুর পারাপার করে। বাড়ি ফেরবার মুখে আমাদের চলার উৎসাহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে; যে পথ আমাদের তিন দিনে শেষ করবার কথা, আমরা পাকা দুদিনেই শেষ করে ফেলেছিলাম। তার আরও কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম হোলো,—এ অঞ্চলের পায়ে হাঁটা রাস্তাটি অনেক ভালো। সরকার থেকে সর্বদাই রাস্তাটির তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এই পথটি দিয়ে তিব্বতের ব্যবসায়ীরা তনকপুরে যাতায়াত করে, তা ছাড়া ভারত সরকারের এক সৈন্যাবাসে যাতায়াতের এটি একমাত্র পথ। এখন বেশীরভাগ পথই উৎরাই। কেবল শেষদিকে একটি বড় পাহাড়ে নদী পার হয়ে চার মাইল চড়াইয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। পথ চলতে দেখলাম একদল বর্মা ফেরত যুবক গারোয়ালী সৈনিক, তিন চার বৎসর পরে একমাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। চেহারা দেখে সৈন্যদলের উপযুক্তবলে একটিকেও মনে হোলো না। প্রত্যেকেই রোগা ও দুর্বল, ম্যালেরিয়া রোগীর মত। এ পথে বহু খাদ বা ঢাল পেয়েছি। রাস্তা থেকে নীচে ঢালের দিকে তাকিয়ে নিজেরই ভয় করে উঠতো, মনে হোতো কত উচুতে আমরা আছি। মাঝে মাঝে লোকালয় জন্তু বা মানুষের কোন সাড়া না পেলে উপর থেকে একটি পাথর গাড়িয়ে দিয়ে দেখতাম যে, সেই পাথরটি কেমন করে ক্রমশই বড় পাথর সংগ্রহ করে বিপুল বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে নীচের দিকে। অনেক জায়গায় বৃষ্টির জল পাহাড় ধ্বসে গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে ফেলেছে। কখনো উপর থেকে প্রকাণ্ড পাথরের চাপ এসে রাস্তা আটকিয়ে রেখেছে। আমাদের অনেক স্থানে খুবই সাবধানে চল্‌তে হয়েছিল। এই সব দুর্যোগে সরকারি কুলি ও তদারকেরা সর্বদাই এই নষ্ট রাস্তা মেরামতে নিযুক্ত। প্রায় দুদিন বৃষ্টি কাদায় চলে হিমালয়ের পায়ের কাছে যখন এসে পৌঁছুলাম তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখান থেকে বহুদূর বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও বড় বড় নদীর একটি সুন্দর দৃশ্য

চোখে পড়লো। সমতলভূমির উপরে যে মেঘ জমে আছে—তার উপরের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটি দেখে মনে হয়েছিল যেন সামনে একটি বিশাল সমুদ্র। হিমালয় থেকে নেমে চার মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর "তনকপুর" স্টেশনটি পেলাম। এই বনপথে, দুপাশে অনেক রকম বড় ছোট হরিণের দল চোখে পড়লো। কখনো একশো গজ দূর দিয়ে তারা আমাদের দেখে নির্ভাবনায় চলে গেছে। বনের ভিতরে জঙ্গল বেশী নেই তাই এদের গতিবিধি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যেতো। বড় বড় সিংওয়ালা হরিণগুলো যখন ছোটে তখন তাদের মাথা সমেত সিং বাগিয়ে নেবার ভঙ্গিটি দেখতে মজার। পাছে গাছের ডালে আটকে গিয়ে চলার ব্যাঘাত করে এই জন্যেই বোধ হয় এই সতর্কতা। দাঁড়িয়ে গিয়ে সিং খাড়া করে আর এক মূর্তি ধরে। ফিরতি পথে আমরা ট্রেনে বিশেষ ভীড় পাইনি। সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় গরমও ভোগ করতে হয়নি। পাহাড়ে ভ্রমণে গায়ে ও হাত পায় যা ব্যথা হয়েছিল, ট্রেনে একটি লোক দিয়ে ভালো করে গা টিপিয়ে নেওয়ায় বেশ আরাম বোধ করেছিলাম।

আলমোড়া-মায়াবতী ভ্রমণের মধ্যে মাষ্টারমশায়কে একটিও বড় ছবি আঁকবার চেষ্টা করতে দেখিনি, কেবল চলতি স্কেচ ছাড়া। সঙ্গে বড় কাগজ রং ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তিনি তার কোনটি সেখানে কাজে লাগাতে পারেননি। আলমোড়ার শ্রীযুত বশী সেন তাঁকে জোর করে আঁকাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর আঁকায় মন বসেনি। বলেছিলেন,—ভ্রমণের এই চঞ্চলতার মধ্যে স্থির হয়ে আঁকা চলে না। একটিও ছবি সেখানে আঁকবার চেষ্টা না করে,—শান্তিনিকেতনে ফিরে খুবই দ্রুত অল্প কয়দিনের মধ্যে যে ছয়টি পাহাড়ের ছবি এঁকেছিলেন, সেই কটিতে খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে তাঁর মনকে কিভাবে হিমালয়ের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল। হিমালয়ের রূপ তাঁর পূর্বে আঁকা কোন ছবিতে এত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছিল কিনা জানি না।



শিল্পাচার্য নন্দলাল



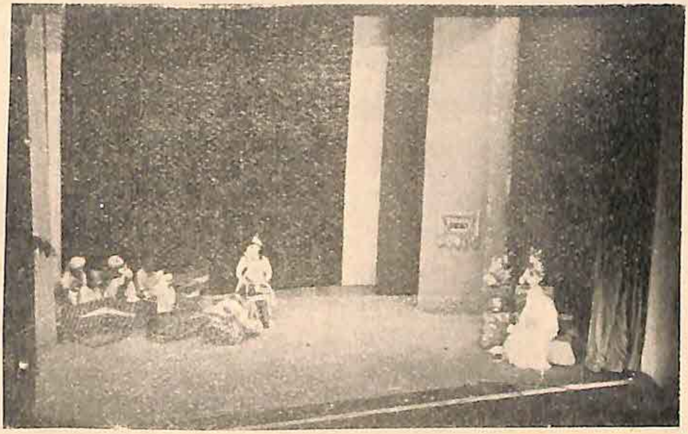
ভ্রাম্যমান নন্দলাল



রূপসজ্জায় রত নন্দলাল



অরূপরতনের বাউল



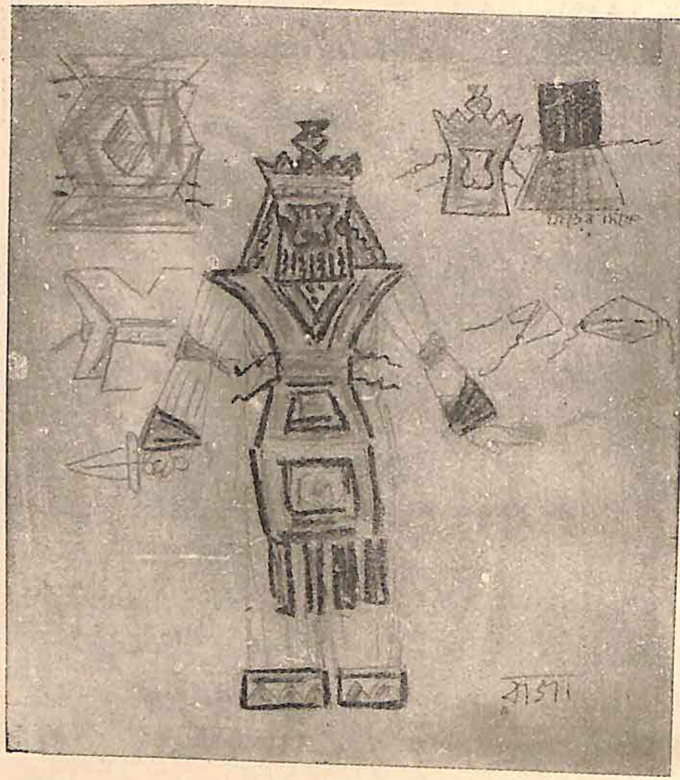
শাপমোচনের একটি দৃশ্য



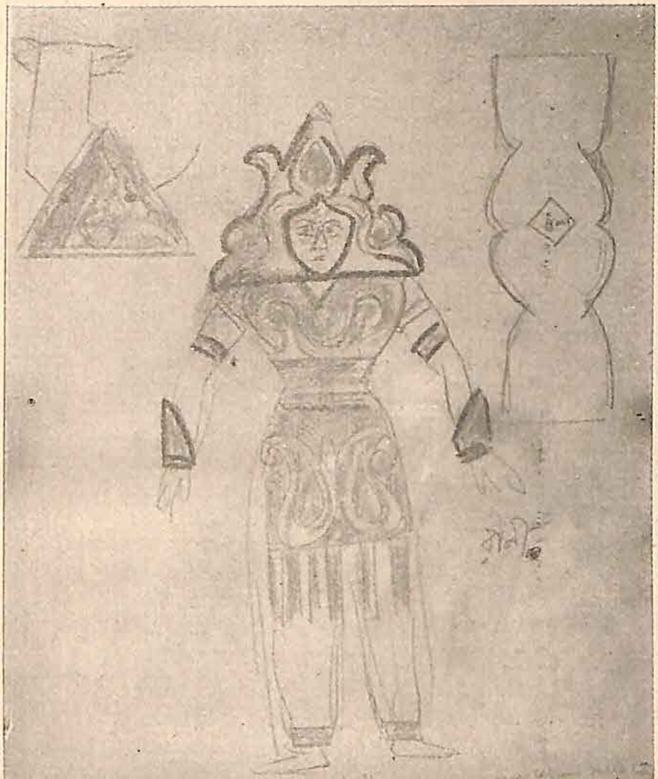
চণ্ডালিকার মা ও মেয়ে



সজ্জা পরিকল্পনা



সজ্জা পরিকল্পনা





নৃত্য



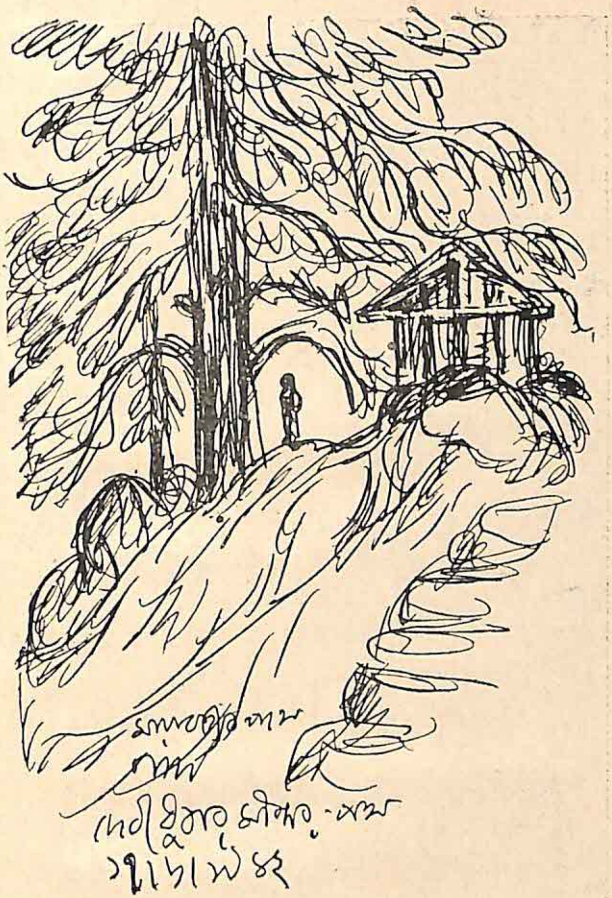
কাথিয়াবাড় নৃত্য



নাইয়ান্তি নর্তক



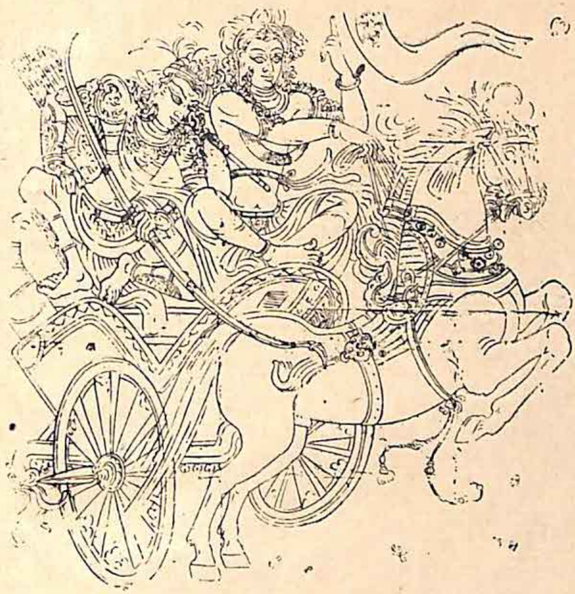
আলমোড়ার পার্ব্বত্য পথ



মায়াবতীর পথে



গীতা উপদেশ



পার্থ সারথী



চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুন

রত্নসাগর গ্রন্থমালা